প্রিয়পাত্র হয়—কারণ, কোনো কার্যে আবদ্ধ না থাকাতে তাহারা সরকারি সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। শহরে যেমন এক-আধটা গৃহসম্পর্কহীন সরকারি বাগান থাকা আবশ্যক, তেমনি গ্রামে দুই-চারিটা অকর্মণ্য সরকারি লোক থাকার বিশেষ প্রয়োজন। কাজকর্মে আমোদ-অবসরে যেখানে একটা লোক কম পড়ে সেখানেই তাহাদিগকে হাতের কাছে পাওয়া যায়।

প্রতাপের প্রধান শখ—ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরা। ইহাতে অনেকটা সময় সহজে কাটানো যায়। অপরাহ্ণে নদীতীরে ইহাকে প্রায় এই কাজে নিযুক্ত দেখা যাইত। এবং এই উপলক্ষে সুভার সহিত তাহার প্রায় সাক্ষাৎ হইত। যে-কোনো কাজেই নিযুক্ত থাক, একটা সঙ্গী পাইলে প্রতাপ থাকে ভালো। মাছ ধরার সময় বাক্যহীন সঙ্গীই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ— এইজন্য প্রতাপ সুভার মর্যাদা বুঝিত। এইজন্য, সকলেই সুভাকে সুভা বলিত, প্রতাপ আর-একটু অতিরিক্ত আদর সংযোগ করিয়া সুভাকে ‘সু’ বলিয়া ডাকিত।

সুভা তেঁতুলতলায় বসিয়া থাকিত এবং প্রতাপ অনতিদূরে মাটিতে ছিপ ফেলিয়া জলের দিকে চাহিয়া থাকিত। প্রতাপের একটি করিয়া পান বরাদ্দ ছিল, সুভা তাহা নিজে সাজিয়া আনিত। এবং বোধ করি অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া চাহিয়া ইচ্ছা করিত, প্রতাপের কোনো-একটা বিশেষ সাহায্য করিতে, একটা-কোনো কাজে লাগিতে, কোনোমতে জানাইয়া দিতে যে এই পৃথিবীতে সেও একজন কম প্রয়োজনীয়া লোক নহে। কিন্তু কিছুই করিবার ছিল না। তখন সে মনে মনে বিধাতার কাছে অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করিত—মন্ত্রবলে সহসা এমন একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটাইতে ইচ্ছা করিত যাহা দেখিয়া প্রতাপ আশ্চর্য হইয়া যাইত, বলিত, ‘তাই তো, আমাদের সুভির যে এত ক্ষমতা তাহা তো জানিতাম না।’

মনে করো, সুভা যদি জলকুমারী হইত ; আস্তে আস্তে জল হইতে উঠিয়া একটা সাপের মাথার মণি ঘাটে রাখিয়া যাইত ; প্রতাপ তাহার তুচ্ছ মাছধরা রাখিয়া সেই মানিক লইয়া জলে ডুব মারিত ; এবং পাতালে গিয়া দেখিত, রুপার অট্টালিকায় সোনার পালঙ্কে কে বসিয়া ?—আমাদের বাণীকণ্ঠের ঘরের সেই বোবা মেয়ে সু—আমাদের সু সেই মণিদীপ্ত গভীর নিস্তব্ধ পাতালপুরীর একমাত্র রাজকন্যা। তাহা কি হইতে পারিত না, তাহা কি এতই অসম্ভব। আসলে কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু তবুও সু প্রজাশূন্য পাতালের রাজবংশে না জন্মিয়া বাণীকণ্ঠের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে এবং গোঁসাইদের ছেলে প্রতাপকে কিছুতেই আশ্চর্য করিতে পারিতেছে না।

৪

সুভার বয়স ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। ক্রমে সে যেন আপনাকে আপনি অনুভব করিতে পারিতেছে। যেন কোনো-একটা পূর্ণিমাতিথিতে কোনো-একটা সমুদ্র হইতে একটা জোয়ারের স্রোত আসিয়া তাহার অন্তরাত্মাকে এক নূতন অনির্বচনীয় চেতনাশক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে, ভাবিতেছে, প্রশ্ন করিতেছে এবং বুঝিতে পারিতেছে না।

গভীর পূর্ণিমারাত্রে সে এক-একদিন ধীরে শয়নগৃহের দ্বার খুলিয়া ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখে, পূর্ণিমা-প্রকৃতিও সুভার মতো একাকিনী সুপ্ত জগতের উপর জাগিয়া বসিয়া—যৌবনের রহস্যে পুলকে বিষাদে অসীম নির্জনতার একেবারে শেষ সীমা পর্যন্ত , এমন-কি , তাহা অতিক্রম করিয়াও থমথম করিতেছে, একটি কথা কহিতে পারিতেছে না। এই নিস্তব্ধ ব্যাকুল প্রকৃতির প্রান্তে একটি নিস্তব্ধ ব্যাকুল বালিকা দাঁড়াইয়া।

এ দিকে কন্যাভারগ্রস্ত পিতামাতা চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছে। লোকেও নিন্দা আরম্ভ করিয়াছে। এমন-কি , একঘরে করিবে এমন জনরবও শুনা যায়। বাণীকণ্ঠের সচ্ছল অবস্থা, দুই বেলাই মাছভাত খায়, এজন্য তাহার শত্রু ছিল।

স্ত্রী পুরুষে বিস্তর পরামর্শ হইল। কিছুদিনের মতো বাণী বিদেশে গেল।

অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, ‘চলো, কলিকাতায় চলো।’

বিদেশযাত্রার উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। কুয়াশাঢাকা প্রভাতের মতো সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুবাষ্পে একেবারে ভরিয়া গেল। একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কাবশে সে কিছুদিন হইতে ক্রমাগত নির্বাক জন্তুর মতো তাহার বাপমায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত—ডাগর চক্ষু মেলিয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া কী বুঝিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাঁহারা কিছু বুঝাইয়া বলিতেন না।

ইতিমধ্যে একদিন অপরাহ্ণে জলে ছিপ ফেলিয়া প্রতাপ হাসিয়া কহিল, ‘কী রে, সু, তোর নাকি বর পাওয়া গেছে, তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস? দেখিস, আমাদের ভুলিস নে।’ বলিয়া আবার মাছের দিকে মনোযোগ করিল।

মর্মবিদ্ধ হরিণী ব্যাধের দিকে যেমন করিয়া তাকায়, নীরবে বলিতে থাকে ‘আমি তোমার কাছে কী দোষ

করিয়াছিলাম’, সুভা তেমনি করিয়া প্রতাপের দিকে চাহিল ; সেদিন গাছের তলায় আর বসিল না। ; বাণীকণ্ঠ নিদ্রা হইতে উঠিয়া সয়নগৃহে তামাক খাইতেছিলেন, সুভা তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া বাণীকণ্ঠের শুষ্ক কপোলে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

কাল কলিকাতায় যাইবার দিন স্থির হইয়াছে। সুভা গোয়ালঘরে তাহার বাল্যসঙ্গীদের কাছে বিদায় লইতে গেল, তাহাদিগকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া, গলা ধরিয়া একবার দুই চোখে যত পারে কথা ভরিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিল—দুই নেত্রপল্লব হইতে টপ টপ করিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল।

সেদিন শুক্লা দ্বাদশীর রাত্রি। সুভা শয়নগৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহার সেই চিরপরিচিত নদীতটে শষ্পশয্যায় লুটাইয়া পড়িল—যেন ধরণীকে, এই প্রকাণ্ড মূক মানবমাতাকে দুই বাহুতে ধরিয়া বলিতে চাহে, ‘তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না মা, আমার মতো দুটি বাহু বাড়াইয়া তুমিও আমাকে ধরিয়া রাখো।’

কলিকাতার এক বাসায় সুভার মা একদিন সুভাকে খুব করিয়া সাজাইয়া দিলেন। আঁটিয়া চুল বাঁধিয়া খোঁপায় জরির ফিতা দিয়া, অলংকারে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার স্বাভাবিক শ্রী যথাসাধ্য বিলুপ্ত করিয়া দিলেন।

সুভার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িতেছে, পাছে চোখ ফুলিয়া খারাপ দেখিতে হয়, এজন্য তাহার মাতা তাহাকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিলেন, কিন্তু অশ্রুজল ভর্ৎসনা মানিল না।

বন্ধু-সঙ্গে বর স্বয়ং কনে দেখিতে আসিলেন— কন্যার মা-বাপ চিন্তিত, শঙ্কিত, শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, যেন দেবতা স্বয়ং নিজের বলির পশু বাছিয়া লইতে আসিয়াছেন। মা নেপথ্য হইতে বিস্তর তর্জন গর্জন শাসন করিয়া বালিকার অশ্রুস্রোত দ্বিগুণ বাড়াইয়া পরীক্ষকের সম্মুখে পাঠাইলেন।

পরীক্ষক অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, ‘মন্দ নহে।’

বিশেষত, বালিকার ক্রন্দন দেখিয়া বুঝিলেন, ইহার উঠিয়াছে সেই হৃদয় আজ বাদে কাল আমারই ব্যবহারে লাগিতে পারিবে। শুক্তির মুক্তার ন্যায় বালিকার অশ্রুজল কেবল বালিকার মূল্য বাড়াইয়া দিল, তাহার হইয়া আর-কোনো কথা বলিল না।

পঞ্জিকা মিলাইয়া খুব একটা শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল।

বোবা মেয়েকে পরের হস্তে সমর্পণ করিয়া বাপ-মা দেশে চলিয়া গেল— তাহাদের জাতি ও পরকাল রক্ষা হইল।

বর পশ্চিমে কাজ করে। বিবাহের অনতিবিলম্বে স্ত্রীকে পশ্চিমে লইয়া গেল।

সপ্তাহখানেকের মধ্যে সকলেই বুঝিল, নববধূ বোবা। তা কেহ বুঝিল না সেটা তাহার দোষ নহে। সে কাহাকেও প্রতারণা করে নাই। তাহার দুটি চক্ষু সকল কথাই বলিয়াছিল, কিন্তু কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে চারি দিকে চায়— ভাষা পায় না, যাহারা বোবার ভাষা বুঝিত সেই আজন্মপরিচিত মুখগুলি দেখিতে পায় না— বালিকার চিরনীবর হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম অব্যক্ত ক্রন্দন বাজিতে লাগিল— অন্তর্যামী ছাড়া আর-কেহ তাহা শুনিতে পাইল না।

এবার তাহার স্বামী চক্ষু এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এক ভাষাবিশিষ্ট কন্যা বিবাহ করিয়া আনিল।

হাতে কলমে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত *ভারতী* ও *বালক* পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। *কথাকাহিনী, সহজপাঠ, রাজর্ষি, ছেলেবেলা, শিশু, শিশু ভোলানাথ, হাস্যকৌতুক, ডাকঘর* প্রভৃতি রচনা শিশু ও কিশোর মনকে আলোড়িত করে। দীর্ঘ জীবনে অজস্র কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। ১৯১৩ সালে *Song Offerings* (গীতাঞ্জলি)-এর জন্য এশিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম নোবেল পুরস্কার পান। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা।

১.১ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত কোন পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত লিখতেন?

১.২ ভারতের কোন প্রতিবেশী দেশে তাঁর লেখা গান জাতীয় সংগীত হিসাবে গাওয়া হয়?

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ সুভার প্রকৃত নাম কী?

২.২ সুভার বাবা কে?

২.৩ সুভা কোন গ্রামে বাস করত?

২.৪ গল্পে সুভার কোন কোন বন্ধুর কথা রয়েছে?

২.৫ কে সুভাকে ‘সু’ বলে ডাকত?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

৩.১ ‘সে নির্জন দ্বিপ্রহর মতো শব্দহীন এবং শব্দহীন’— সুভা সম্পর্কে এ রকম উপমা লেখক ব্যবহার করেছেন কেন?

৩.২ চণ্ডিপুর গ্রামের বর্ণনা দাও।

৩.৩ সুভার সঙ্গে সর্বশী ও পাঙ্গুলির সম্পর্ক কী রকম ছিল?

৩.৪ ‘এইজন্য প্রতাপ সুভার মর্যাদা বুঝিত’— প্রতাপের কাছে সুভা কীভাবে মর্যাদা পেত, তা গল্প অবলম্বনে লেখো।

৩.৫ ‘তাহাদের জাতি ও পরকাল রক্ষা হইল’— কাদের সম্পর্কে এ কথা লেখক বলেছেন? তাঁর এরূপ মন্তব্যের কারণ বিশ্লেষণ করো।

৪. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৪.১ ‘প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়’— মানুষের ভাষার অভাব কীভাবে প্রকৃতি পূরণ করতে পারে তা আলোচনা করো।

৪.২ সুভার সঙ্গে মনুষ্যেতর প্রাণীর বন্ধুত্ব কেমন ছিল তা লেখো।

৪.৩ শুক্লা দ্বাদশীর রাত্রিতে সুভার মনে অবস্থা কেমন ছিল? তার মনের অবস্থা এরকম হওয়ার কারণ কী?

৪.৪ গল্পের একেবারে শেষ বাক্যটি গল্পের ক্ষেত্রে কতখানি প্রয়োজন আলোচনা করো।

৪.৫ মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর বন্ধুত্ব নিয়ে আরো দু একটি গল্পের নাম লেখো এবং ‘সুভা’ গল্পটির সঙ্গে তুলনা করো।

শব্দার্থ : দস্তুরমতো — রীতিমতো/বিলক্ষণ। বিরাজ — সগৌরবে অবস্থান। জাগরূক — জাগ্রত / সজাগ। তরজমা — অনুবাদ। অকর্মণ্য — যে লোক কোনো কাজের নয়। অনির্বচনীয় — যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মর্মবিদ্ধ — হৃদয় বিদারক। কপোল — গাল। শষ্পশয্যা — কচি ঘাসের বিছানা। নেপথ্য — অন্তরাল। শুক্তি — ঝিনুক। অনতিবিলম্বে — শীঘ্রই। অন্তর্যামী — ঈশ্বর।

৫. **নীচের বাক্যগুলিকে কর্তা-খণ্ড ও ক্রিয়া-খণ্ডে ভাগ করে দেখাও :**

৫.১ সে নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন ও এবং শব্দহীন।

৫.২ সে যে কাজকর্ম করিয়া সংসারের উন্নতি করিতে যত্ন করিবে, বহু চেষ্টার পর বাপ-মা সে আশা ত্যাগ করিয়াছেন।

৫.৩ এই বাক্যহীন মনুষ্যের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মতো একটা বিজন মহত্ব আছে।

৬. **নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন করো :**

৬.১ সুভা তেঁতুলতলার বসিয়া থাকিত এবং প্রতাপ অনতি দূরে মাটিতে ছিপ ফেলিয়া জলের দিকে চাহিয়া থাকিত। (জটিল বাক্যে)

৬.২ বাণীকণ্ঠ নিদ্রা হইতে উঠিয়া শয়নগৃহে তামাক খাইতেছিল। (জটিল বাক্যে)

৬.৩ বাণীকণ্ঠের ঘর একেবারে নদীর উপরেই। তাহার বাখারির বেড়া, আটচালা, গোয়ালঘর, ঢেঁকিশালা, খড়ের স্তূপ, তেঁতুলতলা, আম, কাঁঠাল এবং কলার বাগান নৌকোবাহী মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
(একটি জটিল বাক্যে পরিণত করো।)

৬.৪ প্রকৃতি যেন তাহার ভাষা অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়।
(একটি সরল বাক্যে পরিণত করো)

৭. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

৭.১ অনু —
ভব = অনুভব
মান = অনুমান
☐ = ☐
☐ = ☐

৭.২ প্র —
☐ = ☐
☐ = ☐
☐ = ☐

৭.৩ দিগ্‌বিদিক = ☐ + ☐

৭.৪ ☐ > গেরস্ত

৭.৫ পঞ্জিকা > ☐

পরাজয়

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

রাগে ফুঁসছিল রঞ্জন। একটু আগে ও সবকটা কাগজে বারপুজোর রিপোর্ট পড়েছে। ছবি দেখেছে। রিপোর্টগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছে। ওদের ক্লাবের অনুষ্ঠানে কে কে ছিল সেইটাই ও দেখতে চেয়েছিল বেশি করে। এখন কাগজগুলো পড়ে আছে টেবিলের ওপর। আর রঞ্জন ঘরের মধ্যে চরকির মতো ঘুরছে।

এত দুঃখ, এত ব্যথা সে কখনও পায়নি। গত পনেরো বছর যে ক্লাবের জন্যে সে রক্ত ঝরাল আজ তারাই কি না তাকে এত বড়ো অপমানটা করল। ওকে একবার ডাকার দরকার মনে করল না! প্রত্যেক বছর ফোনের পর ফোন আসে। প্রেসিডেন্ট ফোন করেন, সেক্রেটারি ফোন করেন, ফুটবল সেক্রেটারি ফোন করেন। ক্লাবের বারপুজোয় যাবার জন্যে বলতে বাড়িতেও আসেন কেউ কেউ। তারপর পয়লা বৈশাখ সাত সকালে মাঠে যাবার জন্যে গাড়ি এসে হাজির হয়। রঞ্জনও চান-টান করে তৈরি থাকে। গাড়ি এলেই বেরিয়ে পড়ে। গত পনেরো বছর ধরে এই রেওয়াজ চলছিল। গত বছরই রঞ্জন অনুভব করেছিল, ওকে নিয়ে মাতামাতিটা ঠিক

আগের মতো আর নেই। কেমন যেন একটু ছাড়া ছাড়া ভাব। গায়ে মাখেনি রঞ্জন। ভেবেছিল, ও তো পুরোনো খেলোয়াড়, এত নতুন খেলোয়াড়দের দিকে, যারা ক্লাব ছেড়ে যাবার কথা ভাবছে তাদের দিকে বেশি নজর দেওয়া ভালো। তবু মনটা যে একটু খুঁত খুঁত করেনি তা নয়। একবার মনে হয়েছিল, তবে কি ক্লাবে ওর দর কমে গেছে? কথাটা মনে হওয়ায় ওর মনটাও একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তবে গুরুত্ব দেয়নি।

ফুটবল সেক্রেটারি আর কোচ এসে ওর সঙ্গে দল গড়া নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। কাকে কাকে এবার দলে আনা যায় তাই নিয়ে ওর পরামর্শ চেয়েছিলেন। ওঁদের সঙ্গে কথা বলার পর ওর মনের মধ্যে জমে ওঠা মেঘটা কেটে গিয়েছিল। ঠিক এক বছর আগের ঘটনা।

আর এবার!

গাড়ি পাঠানো তো দূরের কথা, মাঠে যাবার জন্যে ওকে কেউ একবার বললও না। একটা টেলিফোন ও তো করতে পারত। ও ভেবেছিল, বলেনি তো কী হয়েছে। গাড়ি নিশ্চয়ই পাঠাবে। তাই সক্কাল বেলায় চান-টান করে ও রেডি হয়ে বসেছিল। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা ঘুরে গেল, সকাল গড়িয়ে গেল গাড়ি এল না। কেউ টেলিফোন করেও বলল না, গাড়ি পাঠাতে পারলাম না—তুই চলে আয়।

সারাটা সকাল ও ছটপট করে বেড়িয়েছিল। দুঃখ আর অভিমান ওকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। এই রকম কষ্ট

কোনোদিন সে পায়নি। পরে সে ভীষণ অপমানিত বোধ করেছিল। বুঝেছিল, ইচ্ছে করে ওকে অপমান করা হয়েছে। এইভাবে ওকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো, ওকে আর ক্লাবের দরকার নেই। গত পনেরো বছরে শত প্রলোভনে সে ভোলেনি, লক্ষ লক্ষ টাকার অফার, বিশাল চাকরির হাতছানি সে যে ক্লাবের কথা ভেবে হাসতে হাসতে ফিরিয়ে দিয়েছিল সেই ক্লাবই আজ তাকে এত বড়ো অপমান করল। ক্লাবের বারপুজোয় একবার ডাকার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করল না!

রঞ্জন সারাটা দিন আর বাড়ি থেকে বেরোয়নি। হালখাতার কোনো নেমন্তন্নেও যায়নি। নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। বুঝতে পারছিল না কী করবে। অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ওর মনের মধ্যে জমে ওঠা দুঃখ আর অভিমান রূপান্তরিত হয়েছিল রাগে। যাদের জন্যে এত বছর ধরে সে নিজেকে নিঃশ্বেস করে দিল আজ তার খেলোয়াড় জীবনের অন্তিম লগ্নে পৌঁছে তাদের কাছ থেকে এই রকম ব্যবহার পেল!

কথাটা মনে হতেই রাগে ফুঁসে উঠল রঞ্জন। ও কি ফুরিয়ে গেছে? ও কি শেষ হয়ে গেছে? ওরা কি তা হলে তাই ভাবছে? ঠিক আছে, ওদের চ্যালেঞ্জ সে গ্রহণ করল। খেলার মাঠেই সে প্রমাণ করে দেবে যে এখনও ফুরিয়ে যায়নি। কিন্তু কী ভাবে? ক্লাবের কর্তাদের হাবভাব দেখে সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে, তাকে আর ওদের দরকার নেই। নতুন ছেলেদের নিয়ে যে মাতামাতি করা হচ্ছে তার সিকিভাগও যদি ওর মতো পুরোনো খেলোয়াড়দের নিয়ে করা হতো তাহলে অবস্থা অন্যরকম হতো। তবে কি ওকে ক্লাব ছেড়ে দিতে হবে? আঁতকে উঠল রঞ্জন। এ সে কী ভাবছে? ক্লাব ছেড়ে দেবে— সে? অসম্ভব। এই ক্লাবের জার্সিকে সে মায়ের মতো ভালোবাসে। গত পনেরো বছর ধরে ঐ দশ নম্বর জামাটা ওকে শক্তি দিয়েছে, ওকে যশ, মান, অর্থ প্রতিপত্তি সবই দিয়েছে। রঞ্জন কল্পনাও করতে পারে না। এ কথা ভাবাও যে পাপ। তা হলে সে কী করবে? ভেবে পায় না রঞ্জন। ছটফট করে নিজের মনে।

অফিসে গিয়েও নিস্তার নেই। অনেক খেলোয়াড়ই ওদের অফিসে কাজ করে। তা ছাড়া খবরের কাগজে ফলাও করে সব বেরিয়েছে। তাই জনে জনে এসে জিজ্ঞেস করতে শুরু করল, রঞ্জনদা তুমি কাল ক্লাবে যাওনি?

না রে! কাল সকালেই আমায় কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল।

ও তাই বলো! আমরা তো ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, নান্টুদাকে জিজ্ঞেস করলাম। নান্টুদা বলল, ঠিক জানে না তুমি কেন এলে না। আমরাও ভেবে পাচ্ছিলাম না কি হলো।

রঞ্জনের মনের মধ্যে সেই কষ্ট কষ্ট ভাবটা আবার জেগে উঠল। নান্টুদা বাড়ি যায়, বারবার ফোন করে, গাড়ি পাঠায়— আর এবার জানেই না কেন সে ক্লাবের বারপুজোয় যায়নি। তবে কি ওরা ওকে ক্লাবে রাখতে চায় না? এইভাবে অপমান করে বুঝিয়ে দিচ্ছেও ক্লাবে অবাঞ্ছিত। রঞ্জনের মাথার মধ্যেটা ঝিমঝিম করে উঠল। না, আজ আর অফিসে থাকতে পারবে না। উঠে পড়ল। বেরিয়ে পড়ল অফিস থেকে। কিন্তু যাবে কোথায়? বাড়িও যাওয়া যায় না। বাড়ি গেলে মা আবার ভাবতে বসবে। অন্য সময় হলে ক্লাবে চলে যেত। একবার ভাবল, ক্লাবেই যাবে। পরমূহূর্তে ওর মনটা বিদ্রোহ করে উঠল। গতকাল ক্লাবে অমন হৈ চৈ হলো, অত ঘটা করে বারপুজো হলো সেখানে থাকার জন্যে যখন ওকে কেউ বলেইনি তখন ও গাড়িটা নিয়ে চলে গেল গঙ্গার ধারে। এখন অফিসের সময়, স্কুল-কলেজও খোলা। এখন নিশ্চয়ই গঙ্গার ঘাটে কোনো চেনা লোকের সামনে ওকে পড়তে হবে না। গাড়িটা পার্ক করে রঞ্জন একটা বেঞ্চির উপর গিয়ে বসল। গঙ্গার ধারে গাছের পাতায় পাতায় ঝিরঝিরে হাওয়া। কানে ভেসে আসে পাখির ডাক। গঙ্গার জলে ছোটো ছোটো ঢেউ। দূরে নোঙর করে কটা ছোটো বড়ো জাহাজ। রঞ্জন নামগুলো পড়ার চেষ্টা করে। অনেকগুলো নৌকো দাঁড়িয়ে আছে যাত্রীর

আশায়। ফেরি স্টিমারগুলোর জন্য ওদের খুব অসুবিধা হয়ে গেছে। দূরে কোথায় কোনো এক পাতার আড়ালে একটা কোকিল ডাকছে। কোকিলের ডাক আজকালতো আর শোনাই যায় না। রঞ্জনের মন অনেকটা হালকা হয়ে যায়। ও ঠান্ডা মাথায় ভাবতে চেষ্টা করে ওর এখন কী করা উচিত। ওদের ক্লাবের কর্তারা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে ওকে আর দরকার নেই। তাহলে কি ও ক্লাব ছেড়ে দেবে? কথাটা মনে হতেই ওর বুকের মধ্যেটা কীরকম যেন করে উঠল। বুকের মধ্যে চেপে রাখা যন্ত্রণাটা ঠেলে উপরের দিকে উঠে এসে কণ্ঠার কাছে দলা পাকিয়ে আটকে গেল। রঞ্জন বুঝল, ওর চোখদুটো ভারী হয়ে উঠেছে। শুধু ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ার অপেক্ষা। রঞ্জন পকেট থেকে রুমালটা বের করল। চোখটা মুছে রঞ্জন উঠে দাঁড়াল। কী করবে ও ঠিক করে ফেলেছে। দুটো দিন ও অপেক্ষা করবে। এর মধ্যে ওর সঙ্গে যদি ক্লাবের কেউ যোগাযোগ করে ভালো, না করলে ও ক্লাব ছেড়ে দেবে। না, খেলা ও ছাড়বে না। দেখিয়ে দেবে, ও ফুরিয়ে যায়নি।

সিদ্ধান্তটা নেওয়ার পর রঞ্জনের মন অনেকটা শান্ত হলো। ও উঠে দাঁড়াল। এখন কোথায় যাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে গাড়িতে উঠে বসল।

পরের দুটো দিন ছটফট করে বেড়াল রঞ্জন। অফিস ছাড়া আর কোথাও গেল না। কারও সঙ্গে ভালো ভাবে কথাও পর্যন্ত বলল না। অফিসে সহকর্মী খেলোয়াররা ওর চেয়ে বয়সে ছোটো। রঞ্জনদাকে অত গম্ভীর দেখে তারা আর কাছে ঘেঁষল না। দুদিন পুরো সময় অফিস করল রঞ্জন। দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত এই প্রথম বোধ হয় রঞ্জন সরকারি অফিসে কাটাল। রঞ্জন আশা করেছিল যদি ক্লাবের কেউ আসে। বাকি সময় বাড়িতে টেলিফোনের কাছাকাছি। বাড়ির লোক অবাক, ছেলেটার হলো কী! বাড়ি থেকে নড়ছে না মোটেই। তবে ওর চোখ মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, প্রচণ্ড টেনশনের মধ্যে আছে। তাই কেউ আর ঘাঁটায়নি ওকে। দুটো দিন কেটে গেল — ক্লাব থেকে কেউ আসাতো দূরের কথা কেউ একটা টেলিফোন পর্যন্ত করল না।

নিজের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত রঞ্জন তৃতীয় দিন রাত্তিরে টেলিফোন করল অন্য বড়ো ক্লাবের সেক্রেটারিকে।

স্বপনদা আমি রঞ্জন সরকার বলছি।

রঞ্জন—মাই গড্। তুমি আমায় ফোন করবে কোনোদিন ভাবতেও পারিনি। যেমন আছ ভাই?

ভালোই।

তোমাদের ক্লাবের কী খবর? খুব ধুমধাম করে এবার বারপুজো হলো। শুনলাম তুমি যাওনি।

রঞ্জন একটু ইতস্তত করে আস্তে আস্তে বলল, হ্যাঁ স্বপনদা... ওরা আমাকে ডাকেনি। কী বলছো রঞ্জন! তোমায় ওরা ডাকেনি এ কখনও হতে পারে? তুমি যে ওদের জন্যে তোমার জীবন দিয়ে দিয়েছ!

তার পুরস্কার এতদিনে পেলাম স্বপনদা। অবহেলা , অপমান।

ওরা তোমায় একবার ফোনও করেনি?

না স্বপনদা...

রঞ্জনের গলা জড়িয়ে এল। স্বপন যা বোঝার মুহূর্তের মধ্যে বুঝে নিল।

রঞ্জন তুমি বাড়ি থেকে বলছো তো? আমি আসছি । আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব।

ঠিক আছে।

রঞ্জন টেলিফোনটা রেখে দিল। এতদিন ঐ স্বপনরাই ওকে বার বার ফোন করেছে। দেখা করেছে। লক্ষ লক্ষ টাকার প্রলোভন দেখিয়েছে। রঞ্জন পাত্তাও দেয়নি। নিজের ক্লাবকে সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। পনেরো বছর আগে সেই যে খিদিরপুর থেকে এসেছিল তারপর আর কোনোদিন সে ক্লাব ছাড়েনি। বাংলার হয়ে খেলেছে, ভারতের হয়ে খেলেছে। একাধিকবার বাংলা আর ভারতীয় দলের অধিনায়ক হয়েছে। অর্জুন পুরস্কার পেয়েছে। ক্লাবপ্রীতির আদর্শ নমুনা হিসেবে এতদিন ওর নামই সকলে উল্লেখ করত। অন্য ক্লাব যখন ওকে তিন-চার লাখ টাকা দেবার কথা বলতও তখন নিজের ক্লাব থেকে এক-দেড় লাখ টাকা নিয়েই খুশি থাকত বিনিময়ে সে শুধু চেয়েছিল একটু সম্মান, একটু ভালোবাসা, একটু আন্তরিকতা। তার এই আত্মত্যাগের বিনিময়ে এবার সে কি পেল? অপমান আর অবহেলা। বারপুজোয় না ডাকা মানেই তো বুঝিয়ে দেওয়া তোমাকে আর আমাদের দরকার নেই। রঞ্জনের মনে পড়ল নান্টুদা একদিন বলেছিল, বারপুজোর দিন ক্লাবের সব থেকে নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়দের মাঠে আনতেই হয়। 'যাদের আনা হয় না — বুঝবি তাদের না হলেও ক্লাবের চলে যাবে।'

এতদিনে রঞ্জন তাহলে সেই দলে পড়ল। বারপুজোর দিন তাকে না ডেকে ক্লাব বুঝিয়ে দিল, রঞ্জন সরকার, তোমাকে আর আমাদের দরকার নেই। কথাটা মনে হতেই রঞ্জনের শরীরটা টানটান হয়ে উঠল। রাগে, দুঃখে, অভিমানে ফুঁসে উঠল। এই অপমান সে মুখ বুজে সহ্য করবে না।

সেই মুহূর্তে কলিং বেলটা বেজে উঠল। রঞ্জন বুঝল, স্বপন এসে গেছে।

স্বপন জানেন টোপ খাওয়া মাছ কী ভাবে খেলিয়ে ডাঙায় তুলতে হয়। তাই ঘরে ঢুকেই বললেন, সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত মন খারাপ করছ কেন রঞ্জন?

সামান্য ব্যাপার? আপনি কী বলছেন স্বপনদা! এত বড়ো অপমান ...

দেখো কোনো কারণে ভুল বোঝাবুঝিও তো হয়ে থাকতে পারে!

তারপর দুদিন কেটে গেছে স্বপনদা — ওরা আসা তো দূরের কথা কেউ একটা ফোন পর্যন্ত করেনি।

সত্যি ওরা তোমার সঙ্গে উচিত কাজ করেনি।

আপনি বলুন স্বপনদা — এই ক্লাবের জন্য আমি আমার জীবন দিয়েছি। আপনারাই তো বারবার লক্ষ লক্ষ টাকার অফার দিয়েছেন। আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। ওরা যা দিয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট ছিলাম। আমায় মাথায় তুলে সবাই নাচুক এ আমি কোনোদিন চাইনি। চেয়েছিলাম একটু সম্মান, একটু মর্যাদা। ওরা এবার সেটাও দিল না। উল্টে বুঝিয়ে দিল — আমাকে আর ওদের দরকার নেই।

এখন তুমি কী করতে চাও?

রঞ্জন ইতস্তত করে। মুখ ফুটে কথাটা বলতে পারে না। ওকে ইতস্তত করতে দেখে স্বপনবাবু বললেন, তুমি যদি আমাদের ক্লাবে আসতে চাও তাহলে তোমায় আমরা মাথায় তুলে নিয়ে যাব। তোমার প্রাপ্য সম্মান তুমি পাবে। আর টাকাকড়ির ব্যাপারে —গত বছর তোমার ক্লাব যা দিয়েছিল তার চেয়ে কম তো দেবোই না। বেশি দেবার চেষ্টা করব ...

রঞ্জন বাধা দিয়ে বলে উঠল, স্বপনদা টাকার কথা তুলবেন না। আমি টাকার জন্যে দল ছাড়ছি না। আমি ... আমি ...

আমি জানি রঞ্জন! মনে রেখো টাকারও দরকার আছে। ঠিক আছে... ও ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তোমায় শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করছি...

কী?

তুমি মন স্থির করে ফেলেছ তো? পরে পিছিয়ে আসবে না? আর একটু ভেবে দেখো। আমি জানি, ক্লাব তোমার কাছে কী! খেলোয়াড় জীবনের অন্তিম লগ্নে পৌঁছে তুমি সেই ক্লাব ছেড়ে দিতে চাইছ। আর একটু ভেবে দেখো। ওরা সত্যিই তোমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে। এই ভাবে তোমায় অপমান করার কোনো অধিকার ওদের নেই। এ অন্যায় ... অন্যায়...

স্বপনদার কথা শুনে রঞ্জনের মনের মধ্যে চেপে রাখা রাগটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল। ও বুঝল না, ওকে তাতাবার জন্যেই স্বপন ও কথা বলছেন। বলল, না না স্বপনদা আমি ডিসিশান নিয়ে ফেলেছি। এ অপমান আমি সহ্য করব না। আপনি সব ব্যবস্থা করুন।

ঠিক আছে। আমি একবার ঘোষদার সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি। এবার দলবদলের সময় পিছিয়ে যাওয়ায় দেখছি ভালোই হয়েছে। তুমি প্রথম দিনেই সই কোরো। দাঁড়াও ঘোষদার সঙ্গে তোমায় কথা বলিয়ে দিয়ে সব কিছু এখনই ফাইনাল করে ফেলি, কেমন?

স্বপন উঠে গিয়ে টেলিফোনটা তুলে নিল। কলকাতায় একবারে কোনো নম্বরই পাওয়া যায় না। চার পাঁচবার চেষ্টা করার পর স্বপন ঘোষদাকে পেল। স্বপন বলল,

ঘোষদা একটা বড়ো খবর আছে।

কী?

রঞ্জন মানে রঞ্জন সরকার আমাদের ক্লাবে আসতে চাইছে।

সত্যি!

হ্যাঁ। ওর সঙ্গে আমার পাকা কথা হয়ে গেছে। আপনি একটু এর সঙ্গে কথা বলুন।

হ্যাঁ — দাও দাও...

স্বপন রঞ্জনের হাতে টেলিফোনটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, ঘোষদা কথা বলবেন।

হ্যালো — রঞ্জনের গলাটা একটু কেঁপে উঠল।

রঞ্জন ভাই কেমন আছ! ওয়েলকাম টু আওয়ার ক্লাব। আমার স্বপ্ন ছিল তুমি অন্তত একবার আমাদের ক্লাবের জার্সি গায়ে দাও। এত দিনে সে স্বপ্ন সফল হবে। তোমায় আমরা মাথায় করে রাখব।

রঞ্জনের মুখে খেলে গেল ম্লান হাসি। বলল, আমি কিন্তু টাকার জন্যে দল ছাড়ছি না।

জানি জানি — তুমি সেরকম ছেলে নও। তোমার প্রাপ্য সম্মান তুমি আমাদের ক্লাব থেকে পাবেই। তুমি ভাই স্বপনকে একটু ডেকে দাও।

স্বপনদা তোমায় ডাকছেন।

রঞ্জন টেলিফোনটা এগিয়ে দিল। স্বপন সাড়া দিতেই ওদিক থেকে ঘোষদার গলা ভেসে এল। গলায় চাপা উল্লাস।

স্বপন একদম ফাইনাল করে নাও। টাকার জন্যে ভেবো না। যত লাগে লাগুক। রঞ্জনকে টেনে নিতে পারলে ওদের মুখে ঝামা ঘষে দেওয়া যাবে। আর শোনো ব্যাপারটা একদম চেপে রাখবে। রঞ্জনকেও বলবে, সই করার আগে পর্যন্ত কেউ যেন জানতে না পারে।

ঠিক আছে।

স্বপন রিসিভারটা রেখে দিয়ে রঞ্জনের সামনে গিয়ে বসল। বলল, ঘোষদা বলেছেন সই করার আগে পর্যন্ত তোমার দল ছাড়ার কথা কেউ যেন না জানে!

আমিও তাই চাই।

তুমি কবে সই করবে? প্রথম দিনেই...

হ্যাঁ, প্রথম দিনই...

তাই হলো। বাংলার ফুটবল সমাজকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়ে দলবদলের প্রথম দিনই রঞ্জন সরকার দল ছাড়ল। খেলোয়াড় হিসেবে নাম করার পর থেকে এতদিন যে ক্লাবের সুখ-দুঃখের সঙ্গী ছিল রঞ্জন, তার জীবনের সোনালি দিনগুলো কেটেছে যে ক্লাবে, শত প্রলোভনেও যে কোনোদিন দল বদল করার কথা ভাবেনি সেই রঞ্জন সরকার একরাশ অপমান মাথায় নিয়ে সরে এল তার ভালোবাসার ক্লাবটি থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো কাগজে লেখালিখি, রঞ্জন সরকারের দল ছাড়ার কারণ হিসেবে নানা গবেষণা। রঞ্জনের পুরোনো ক্লাবের সমর্থকরা ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলেন ক্লাব তাঁবুর সামনে। তাঁদের দাবি রঞ্জন সরকারকে ফিরিয়ে আনতে হবে। জবাব দিতে হবে কেন রঞ্জন সরকার দল ছেড়েছে। খবরের কাগজের রিপোর্টারদের কথা শুনতে হলো ক্রীড়া সম্পাদকদের কাছে। কেন এত বড়ো খবরটার কোনো আঁচ তাঁরা পাননি।

রঞ্জন দলবদল করার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে টনক নড়েছিল ক্লাব কর্তাদের। তাঁরা রঞ্জনের বাড়ি ছুটোছুটি শুরু করলেন। জনে জনে ফোন করতে আরম্ভ করলেন। রঞ্জন যে সব খেলোয়াড়দের ছোটো ভাইয়ের মতো দেখে, ভালোবাসে তাদের লাগানো হলো তার মত বদল করানোর জন্যে। কিন্তু তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। কোথায় রঞ্জন! তার চুলের টিকি পর্যন্ত কেউ দেখতে পেল না। দলবদল করার সঙ্গে সঙ্গেই স্বপন তাকে সরিয়ে দিয়েছে অনেক দূরে। রঞ্জনকে সকলে যখন হন্যে হয়ে খুঁজছে সে তখন সিকিমের পেলিংয়ে পান্ডিম আর কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার শৃঙ্গগুলোর দিকে তাকিয়ে বসে মাউন্ট পান্ডিম হোটেলে, তার ঘরে।

স্বপনরা যা চেয়েছিল তাই হলো। রঞ্জনকে হারানোর মোক্ষম ধাক্কা খেল তার পুরোনো ক্লাব। আর সে যে ফুরিয়ে যায়নি একথাটা প্রমাণ করার জন্যে মরসুমের শুরু থেকেই দুর্দান্ত খেলতে লাগল রঞ্জন। গোলের পর

গোল করতে লাগল।

দেখতে দেখতে এসে গেল রঞ্জনের অগ্নি পরীক্ষার দিন। সল্ট লেক স্টেডিয়ামে দুই বড়ো দলের প্রথম লড়াই। উত্তেজনায়, উৎসাহে শহর টানটান। দুই প্রধানের লড়াইকে কেন্দ্র করে অনেক বছর পরে কলকাতা আবার মেতে উঠেছে। সল্ট লেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণে এক লক্ষ কুড়ি হাজার দর্শকের খেলা দেখার ব্যবস্থা। তবু টিকিটের জন্যে হাহাকার পড়ে গেছে। সকলেরই ধারণা একটা দারুণ কিছু ঘটবে। অনেকদিন পরে সত্যিকারের একটা ভালো খেলা দেখা যাবে।

রেডিও, টিভি, সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা ভীষণ ব্যস্ত। এই খেলাটিকে কেন্দ্র করে সারা দেশে যে উৎসাহ আর উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে তাল দিতে তাঁরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। সমস্ত প্রচার সমস্ত জল্পনা-কল্পনার মধ্যমণি কিন্তু রঞ্জন। অবস্থাটা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে—খেলাটা যেন রঞ্জনের সঙ্গে তার পুরোনো দলের লড়াই।

রঞ্জনের মধ্যেও প্রচণ্ড একটা জেদ তাকে টানটান করে তুলেছে। আজ সময় এসেছে সব অপমানের বদলা নেবার। সে যে সত্যিই ফুরিয়ে যায়নি তা প্রমাণ করে দেবার। তার জন্যে সে তৈরি। অপেক্ষা শুধু মাঠে নামার। তবু কোথায় যেন একটু দ্বিধা, একটু আড়ষ্টভাব, চেপে রাখা একটু কষ্ট রঞ্জনকে এক এক সময় বিব্রত করে তুলছে। রঞ্জন নিজেকে বোঝায়, ও তো এ চায়নি। আজকের এই পরিস্থিতি ওর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। না, এসব দুর্বলতা রঞ্জন পাত্তা দেবে না। যে অবহেলা, যে অপমান ওকে করা হয়েছিল তার বদলা তাকে নিতেই হবে। আজই মাঠে প্রমাণ করে দিতে হবে, নান্টুদারা ভুল করেছিল। হ্যাঁ আজই। সময় সে আর পাবে না। যা করার আজই করতে হবে। ঐ এক লক্ষ লোককে সাক্ষী রেখে প্রমাণ করে দিতে হবে— রঞ্জন সরকার সত্যিই ফুরিয়ে যায়নি।

কথাটা মনে হতেই শরীরটা টানটান হয়ে উঠল রঞ্জনের। ও এগিয়ে গেল সল্ট লেকে যাবার জন্যে ক্লাব তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লাক্সারি বাসটার দিকে।

সল্ট লেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণে লক্ষ লোকের সামনে দুরন্ত গতিতে চলছে দুই প্রধানের খেলা। রঞ্জনকে সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে তার পুরোনো দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা। মাত্র একজনকে সামনে রেখে বাকি দশজনকেই ওরা নীচে নামিয়ে এনেছে। দশ জনের সঙ্গে একা লড়ছে রঞ্জন। রঞ্জনের সহ খেলোয়াড়রা ঠিক ভাবে পাল্লা দিতে পারছে না। ওদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাচ্ছে না রঞ্জন। এইভাবে শেষ হলো প্রথম অর্ধের খেলা।

দ্বিতীয়ার্ধে খেলার চেহারা পুরোপুরি বদলে গেল। যারা এতক্ষণ দেওয়ালে পিঠ দিয়ে লড়ছিল তারাই এখন রুখে দাঁড়াল। রক্ষণাত্মক মনোভাব ছেড়ে তারা আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাতে সুবিধে অবশ্য রঞ্জনেরই হলো। এতক্ষণ ধরে পায়ে পায়ে খেলোয়াড় ঘুরছিল। এবার তারা খানিকটা সরে গেছে। তবে ওর পেছনে পুলিশম্যান ঠিকই লেগে রইল। তবু আক্রমণে প্রতি-আক্রমণে খেলাটা রীতিমতো জমে উঠল।

কিন্তু গোল কেউ করতে পারছে না। সময় কেটে যাচ্ছে দ্রুত। রঞ্জন ভালো খেলছে ঠিকই কিন্তু ও যেভাবে জ্বলে উঠতে চেয়েছিল তা এখনও পারেনি। অথচ এই সুযোগ সে নষ্ট করতে চায় না। সে জানে দু-দলের সমর্থকদের নজর এখনও ওর ওপরেই আছে। তাই যা করার তা এখনই করতে হবে।

রঞ্জন নীচে নেমে এল। নিজেদের হাফলাইনেরও নীচে। ঠিক সেই সময় ওদের গোলরক্ষক একটা বল পেয়ে

ওর দিকে ছুঁড়ে দিল। রঞ্জন যেন অপেক্ষাতেই ছিল। বলটা ধরে নিয়েই দুলকি চালে এগিয়ে চলল সে। ওকে বাধা দিতে তিনজন খেলোয়াড় আসছে দেখেই বলটা ঠেলে দিল সমরের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে নিজে চলে গেল অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায়। সমর বলটা নিয়ে ক'পা গিয়েই সেই ফাঁকা জায়গার দিকে কোনাকুনি বাড়িয়ে দিয়েই গোলের দিকে এগোতে লাগল। রঞ্জন বলটা ধরে দুজনকে কাটিয়ে পেনাল্টি সীমানার কাছাকাছি এসেই সমরের মাথা লক্ষ্য করে লব করল। সমর হেড দিয়ে বলটা ভাসিয়ে দিল গোলের দিকে। চকিতে রঞ্জন ঘুরে গেল। ওর মুখ তখন নিজেদের গোলের দিকে। ওকে কেউ লক্ষ করেনি। সেই সুযোগটা নিল রঞ্জন। বলটা ওর কাছে ভেসে আসতেই ব্যাক ভলি করল। কেউ কিছু বোঝার আগে বলটা বুলেটের মতো ছুটে গিয়ে ঢুকে গেল গোলে।

ব্যাপারটা কী হলো বুঝতে একটু সময় লাগল সমর্থকদের। তারপর সারা মাঠ ফেটে পড়ল উল্লাসে। দলের খেলোয়াড়রা তখন রঞ্জনকে নিতে মেতে উঠেছে। আর ওদিকে যুবভারতীর গ্যালারি বাজি আর পটকার শব্দে গমগম করে উঠল।

একটু পরেই খেলা শেষ হয়ে গেল। সে যে ফুরিয়ে যায়নি এ কথা প্রমাণ করে, সব অপমান অবহেলার বদলা নিয়ে রঞ্জন সরকার ফিরে এল সাজঘরে।

মাথা নিচু করে সাজঘরে ঢুকে এক কোণ একটা চেয়ারে বসে পড়ল। কই সে রকম আনন্দ তো হচ্ছে না তার? সাজঘরে তাকে নিইে হৈ চৈ চলছে। কেউ একজন এসে রে হাতে কোল্ড ড্রিঙ্কসের একটা বোতল ধরিয়ে দিয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে নিল রঞ্জন। মুখ তুলল না। কী রকম যেন একটা কষ্ট, একটা চাপা বেদনা ওকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। এই হৈ চৈ , এই উল্লাস, এই অভিনন্দন ওর ভালো লাগছিল না। সাংবাদিকরা তখন কোচের সঙ্গে কথা বলছেন। ওর সঙ্গেও কথা বলতে চান ওঁরা। ওঁরা কী জিজ্ঞেস করবেন তাও জানা রঞ্জনের। কিন্তু ওঁদের সত্যি কথা তো বলতে পারবে না সে। স্বপনদাকে বলে পাশের ঘরে চলে গেল। দু হাতে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ল একটা বেঞ্চিতে।

রঞ্জন অবাক হয়ে অনুভব করল— ওর দু চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে। পনেরো বছরের সম্পর্ক ত্যাগ করে আজ সে এ ক্লাবে এলেও সব অপমান, সব অবহেলার বদলা নেবার মুহূর্তে রঞ্জন হেরে গেল। নিজের কাছে। কেঁদে উঠল রঞ্জন। দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে রঞ্জন সরকার। কাঁদছে, শুধু কাঁদছে। কিছুতেই সে নিজেকে সামলাতে পারছে না। পয়লা বৈশাখ বারপুজোয় তাকে না ডাকার অপমানে যে কষ্টটা দলা পাকিয়ে এতদিন ওর কণ্ঠার কাছে আটকে ছিল আজ সেই কষ্ট, সেই জ্বালা চোখের জল হয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেল স্ট্রাইকার রঞ্জন সরকারকে।

হাতে কলমে

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৫) : পড়াশুনো করেছেন টাকী সরকারি বিদ্যালয়, টাকী সরকারি কলেজ ও সিটি কলেজে। এরিয়ান্স ক্লাবের হয়ে খেলেছেন ক্রিকেট। *দৈনিক বসুমতী* ও *যুগান্তর পত্রিকায়* ক্রীড়া সম্পাদক ও পরে *যুগান্তরের* বার্তা সম্পাদক। প্রথম বই *দেরারি* উপন্যাস। *ক্রিকেট খেলার আইনকানুন, ক্লাবের নাম মোহনবাগান, ক্লাবের নাম ইস্টবেঙ্গল, মারাদোনা মারাদোনা, ক্রিকেট খেলা শিখতে হলে, ক্রিকেট মাঠের বাইরে, পাঁচ ক্রিকেটের নক্ষত্র, ফুটবলের পাঁচ নক্ষত্র, রিংয়ের রাজা আলি* প্রভৃতি। তিনি *শুকতারা* ও *নবকল্লোল* পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে কর্মরত।

১.১ শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম বইয়ের নাম লেখো।

১.২ কলকাতার ফুটবল নিয়ে লেখা তাঁর দুটি বইয়ের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর একটি বাক্যে লেখো :**

২.১ 'এত দুঃখ এত ব্যথা সে কখনও পায়নি।' — এখানে কার দুঃখ-বেদনার কথা বলা হয়েছে?

২.২ 'রঞ্জনদা তুমি কাল ক্লাবে যাওনি?' — এই প্রশ্নের উত্তরে রঞ্জন কী বলেছিল?

২.৩ গঙ্গার পাড়ে গিয়ে কোন দৃশ্য রঞ্জনের চোখে ভেসে উঠল?

২.৪ 'সিদ্ধান্তটা নেওয়ার পর রঞ্জনের মন অনেকটা শান্ত হলো।' —এখানে রঞ্জনের কোন সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়েছে?

২.৫ 'ঘোষদা একটা বড়ো খবর আছে।'— কী সেই 'বড়ো খবর'?

২.৬ রঞ্জনের দলবদল করার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে টনক নড়েছিল ক্লাবকর্তাদের।' — কীভাবে ক্লাবকর্তাদের যে টনক নড়েছে, তা বোঝা গেল?

২.৭ 'ব্যাপারটা কী হলো বুঝতে একটু সময় লাগল সমর্থকদের।' — এখানে কোন ব্যাপারটার কথা বলা হয়েছে?

২.৮ 'দুহাতে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ল একটা বেঞ্চিতে।' — স্ট্রাইকার রঞ্জন সরকারের এমনভাবে শুয়ে পড়ার কারণ কী?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৩.১ একটু আগেও সবকটা কাগজে বারপুজোর রিপোর্ট পড়েছে। — এখানে 'ও' বলতে কার কথা বোঝানো হয়েছে? সে সবকটা কাগজে একই বিষয়ের রিপোর্ট পড়ল কেন?

৩.২ ‘ওকে নিয়ে মাতামাতিটা ঠিক আগের মতো আর নেই।’ — আগে ‘ওকে’ নিয়ে কী ধরনের মাতামাতি হতো?

৩.৩ ‘ঠিক এক বছর আগের ঘটনা।’ —একবছর আগে কোন ঘটনা ঘটেছিল?

৩.৪ ‘রঞ্জন সারাটা দিন আর বাড়ি থেকে বোরোয়নি।’ —কোন দিনের কথা বলা হয়েছে?

৩.৫ ‘রঞ্জন নামগুলো পড়ার চেষ্টা করে।’ —রঞ্জন কোন নামগলি পড়ার চেষ্টা করে?

৩.৬ ‘রঞ্জন টেলিফোনটা রেখে দিলো।’ — কোন কথা শুনে রঞ্জন টেলিফোনটা রেখে দিলো?

৩.৭ ‘সত্যি ওরা তোমার সঙ্গে উচিত কাজ করেনি!’ — কোন অনুচিত কাজের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে?

৩.৮ ‘মন স্থির করে ফেলেছ তো?’ —উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কোন বিষয়ে মনস্থির করে ফেলেছে?

৩.৯ ‘আপনি সব ব্যবস্থা করুন।’ — কোন ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে?

৪. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৪.১ ‘রাগে ফুঁসছিল রঞ্জন।’ — তার এই রাগের কারণ কী?

৪.২ ‘এত দুঃখ, এত ব্যথা সে কথাও পায়নি।’ — এই দুঃখ-যন্ত্রণার দিনে কীভাবে অতীতের সুন্দর দিনগুলির কথা রঞ্জনের মনে এসেছে?

৪.৩ রঞ্জনের ক্লাবের সঙ্গে তার পনেরো বছরের সম্পর্ক কীভাবে ছিন্ন হলো? এই বিচ্ছেদের জন্য কাকে তোমার দায়ী বলে মনে হয়?

৪.৪ ‘কী করবে ও ঠিক করে ফেলেছে।’ — এখানে কার কথা বলা হয়েছে? সে কী ঠিক করে ফেলেছে? তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সে পরবর্তী সময়ে চলতে পারল কি?

৪.৫ ‘তৃতীয় দিন রাত্তিরে টেলিফোন করল অন্য বড়ো ক্লাবের সেক্রেটারিকে।’ — কোন দিন থেকে ‘তৃতীয় দিন’-এর কথা বলা হয়েছে? এই দিন তিনেক সময় তার কীভাবে কেটেছে? টেলিফোনটি করায় কোন পরিস্থিতি তৈরি হলো?

৪.৬ ‘দুই প্রধানের লড়াইকে কেন্দ্র করে অনেক বছর পরে কলকাতা আবার মেতে উঠেছে।’ — গল্প অনুসরণে সেই লড়াইয়ের উত্তেজনাপূর্ণ ফুটবল ম্যাচের বিবরণ দাও।

৪.৭ ‘বলটা বুলেটের মতো ছুটে গিয়ে ঢুকে গেল গোলে।’— এরপর সমর্থক আর সহ-খেলোয়াড়দের উল্লাসের বিপ্রতীপে রঞ্জনের বিষণ্ণতার কোন রূপ গল্পে ফুটে উঠেছে?

৪.৮ গল্পের ঘটনা বিশ্লেষণ করে ‘পরাজয়’ গল্পের নামকরণের সার্থকতা প্রতিপন্ন করো।

শব্দার্থ : অবাঞ্ছিত — অকাম্য/চাওয়া হয়নি এমন। জল্পনা-কল্পনা — অনুমান/আলোচনা। অভিনন্দন — আনন্দের সঙ্গে গৌরবের স্বীকৃতি জানানো।

৫. নীচের শব্দগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচার করো :

চরকি, সক্কাল, নেমন্তন্ন, নম্বর, ছুটোছুটি

৬. নীচের বাক্যগুলি থেকে সন্ধিবদ্ধপদ খুঁজে নিয়ে সন্ধিবিচ্ছেদ করো :

৬.১ ওর মনের মধ্যে জমে ওঠা দুঃখ আর অভিমান রূপান্তরিত হয়েছিল রাগে।

৬.২ ক্লাবের কর্তাদের হাবভাব দেখে সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে।

৬.৩ কেউ একটা টেলিফোন পর্যন্ত করল না।

৬.৪ তার পুরস্কার এতদিনে পেলাম স্বপনদা।

৬.৫ ওরা যা দিয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট ছিলাম।

৭. নিম্নরেখাঙ্কিত অংশের কারক বিভক্তি নির্দেশ করো :

৭.১ <u>রঞ্জন</u> ঘরের মধ্যে চরকির মতো ঘুরছে।

৭.২ <u>গাড়ি</u> পাঠানো তো দূরের কথা।

৭.৩ সারাটা <u>সকাল</u> ও ছটফট করে বেড়িয়েছিল।

৭.৪ কানে ভেসে আসে <u>পাখির</u> ডাক।

৭.৫ রঞ্জন <u>টেলিফোনটা</u> রেখে দিল।

৮. নীচের বাক্যগুলির ক্রিয়ার কাল নির্দেশ করো :

৮.১ গুরুত্ব দেয়নি।

৮.২ তুই চলে আয়।

৮.৩ কাল সকালে আমায় কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল।

৮.৪ আমি রঞ্জন সরকার বলছি।

৮.৫ রঞ্জনের মুখে খেলে গেল ম্লান হাসি।

৯. নির্দেশ অনুসারে বাক্য পরিবর্তন করো :

৯.১ এত দুঃখ, এত ব্যথা সে কখনও পায়নি। (হ্যাঁ-সূচক বাক্যে)

৯.২ সিদ্ধান্তটা নেওয়ার পর রঞ্জনের মন অনেকটা শান্ত হলো। (জটিল বাক্যে)

৯.৩ সেই মুহূর্তে কলিংবেলটা বেজে উঠল। (যৌগিক বাক্যে)

৯.৪ রঞ্জনের গলাটা একটু কেঁপে উঠল। (না-সূচক বাক্যে)

৯.৫ যারা এতক্ষণ দেয়াল পিঠ দিয়ে লড়ছিল তারাই এখন রুখে দাঁড়াল। (সরল বাক্যে)

মাসিপিসি

জয় গোস্বামী

ফুল ছুঁয়ে যায় চোখের পাতায়, জল ছুঁয়ে যায় ঠোঁটে
ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি রাত থাকতে ওঠে

শুকতারাটি ছাদের ধারে, চাঁদ থামে তালগাছে
ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি ছাড়া কাপড় কাচে

দু এক ফোঁটা শিশির তাকায় ঘাসের থেকে ঘাসে
ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি ট্রেন ধরতে আসে

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির মস্ত পরিবার
অনেকগুলো পেট বাড়িতে, একমুঠো রোজগার

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির পোঁটলা পুঁটলি কোথায়?
রেল বাজারের হোমগার্ডরা সাত ঝামেলা জোটায়

সাল মাহিনার হিসেব তো নেই, জষ্টি কি বৈশাখ
মাসিপিসির কোলে-কাঁখে চালের বস্তা থাক

শতবর্ষ এগিয়ে আসে — শতবর্ষ যায়
চাল তোলো গো মাসিপিসি লালগোলা বনগাঁয়

হাতেকলমে

জয় গোস্বামী (১৯৫৪) **:** জন্ম কলকাতায়। বাংলা সাহিত্যের এক খ্যাতিমান কবি। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য কবিতার বই *প্রত্নজীব, উন্মাদের পাঠক্রম, ভুতুমভগবান, ঘুমিয়েছ ঝাউপাতা, বজ্রবিদ্যুৎভর্তি খাতা, পাগলী তোমার সঙ্গে* প্রভৃতি। *যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল* তাঁর স্মরণীয় কাব্য-উপন্যাস। তাঁর রচিত বিখ্যাত উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে *সেই সব শেয়ালেরা, সুড়ঙ্গ ও প্রতিরক্ষা* প্রভৃতি। সাহিত্যকৃতির জন্য তিনি *আনন্দ পুরস্কার, সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার* সহ বহুবিধ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

১.১ জয় গোস্বামীর লেখা দুটি কবিতার বইয়ের নাম লেখো।

১.২ জয় গোস্বামীর লেখা একটি উপন্যাসের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির অতিসংক্ষেপে উত্তর দাও:**

২.১ 'অনেকগুলো পেট বাড়িতে ... ' 'পেট'-এর আভিধানিক অর্থ কী? এখানে কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

২.২ 'সাত ঝামেলা জোটায়' — এখানে 'সাত' শব্দটির ব্যবহারের কারণ কী?

২.৩ 'মাহিনা' শব্দটি কবিতায় কী অর্থে ব্যবহৃত? শব্দটির অন্য কোন অর্থ তোমার জানা আছে?

২.৪ কোন শব্দ থেকে এবং কী করে 'জষ্টি' শব্দটি এসেছে?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে লেখো:**

৩.১ 'শুকতারাটি ছাদের ধারে, চাঁদ থামে তালগাছে' — এই পঙ্‌ক্তিটির মাধ্যমে দিনের কোন সময়ের কথা বলা হয়েছে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

৩.২ 'দু একটা ফোঁটা শিশির তাকায় ঘাসের থেকে ঘাসে' — এই পঙ্‌ক্তিটিতে যে ছবিটি ফুটে উঠেছে তা নিজের ভাষায় লেখো।

৩.৩ 'মাস মাহিনার হিসেব তো নেই' — মাস মাহিনার হিসেব নেই কেন?

৪. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৪.১ 'শতবর্ষ এগিয়ে আসে — শতবর্ষ যায়' — এই পঙ্‌ক্তিটির মধ্যে দিয়ে কবি কী বলতে চেয়েছেন আলোচনা করো।

৪.২ 'মাসিপিসি' কবিতায় এই মাসিপিসি কারা? তাঁদের জীবনের কোন ছবি এই কবিতায় তুমি খুঁজে পাও?

৪.৩ 'মাসিপিসি' কবিতার এই মাসিপিসিদের মতো আর কাদের কথা তুমি বলতে পারো যাঁদের ট্রেনের উপর নির্ভর করে জীবিকা অর্জন করতে হয়?

৪.৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ওরা কাজ করে' কবিতাটি তুমি পড়ে নাও। 'মাসিপিসি' কবিতার সঙ্গে 'ওরা কাজ করে' কবিতার কোন সাদৃশ্য তোমার চোখে পড়ল তা আলোচনা করো।

৫. **নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন করো :**

৫.১ ফুল ছুঁয়ে যায় চোখের পাতায়, জল ছুঁয়ে যায় ঠোঁটে। (জটিল বাক্যে)

৫.২ ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি রাত থাকতে ওঠে। (জটিল বাক্যে)

৫.৩ অনেকগুলো পেট বাড়িতে, একমুঠো রোজগার। (যৌগিক বাক্যে)

টিকিটের অ্যালবাম

সুন্দর রামস্বামী

রাজাপ্পা খেয়াল করল, হঠাৎ যেন ওর জনপ্রিয়তা কমে গেছে, গত তিনদিন ধরে সবাই নাগরাজনের চারপাশে ভীড় জমাচ্ছে।

রাজাপ্পা সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে, নাগরাজন বড্ড দাম্ভিক, কিন্তু কেউ ওর কথায় কান দিল না, কারণ নাগরাজনের কাকা সিঙ্গাপুর থেকে টিকিটের যে অ্যালবামটা পাঠিয়েছিল সেটা সে সবাইকে দেখতে দিত। ছেলেরা নাগরাজনের চারপাশে জড় হয়ে অ্যালবামটা চোখ দিয়ে গিলে খেত, যতক্ষণ না সকালের ক্লাশের জন্য স্কুলের ঘণ্টা বাজত; দুপুরের খাবারের ঘণ্টা পড়লেই আবার সবাই ওর চারপাশে ঘোরাঘুরি করত, আর সন্ধ্যাবেলা ওর বাড়ি ধাওয়া করত। নাগরাজন একটুও অধৈর্য না হয়ে ওদের সবাইকে অ্যালবামটা দেখাত। ও কেবল একটা শর্ত করেছিল — কেউ অ্যালবামটা ধরবে না। ও নিজের কোলে অ্যালবামটা রেখে পাতাগুলো উল্টাতো, আর সবাই প্রাণভরে দেখত।

মেয়েদেরও অ্যালবামটা দেখবার ইচ্ছে হতো। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ডানপিটে পার্বতী, নাগরাজনের কাছে এসে মেয়েদের নাম করে চাইত। নাগরাজন মলাট লাগিয়ে অ্যালবামটা তাকে দিত। সব মেয়েদের দেখা হয়ে গেলে সন্ধ্যাবেলা অ্যালবামটা তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হতো।

কেউ রাজাপ্পার অ্যালবামের কথা উল্লেখও করত না, বা তাঁকে পাত্তাও দিত না।

একসময় রাজাপ্পার অ্যালবাম খুব বিখ্যাত ছিল। রাজাপ্পা খুব কষ্ট করে টিকিট জোগাড় করত, যেমন করে মৌমাছিরা মধু সংগ্রহ করে। এটাই যেন ছিল ওর জীবন। সে ভোর বেলায় অন্যান্য টিকিট সংগ্রাহকদের সঙ্গে দেখা করার জন্য বেরিয়ে পড়ত। একটা রাশিয়ার টিকিটের সঙ্গে দুটো পাকিস্তানী টিকিটের বিনিময় করত। বিকেল বেলা স্কুলের সব বই এক কোণে ধুপ করে রেখে, হাফ প্যান্টের পকেটে জলখাবার ঢুকিয়ে, চোঁ চোঁ করে এক কাপ কফি গিলে আবার বেরিয়ে পড়ত। চার মাইল দূরের একটা ছেলের কাছে একটা কানাডার টিকিট আছে...। ওর অ্যালবামটা ছিল ক্লাশের সব চেয়ে বড়ো। রাজস্ব বিভাগের এক অফিসারের ছেলে ওটা পঁচিশ টাকা দিয়ে কিনতে চেয়েছিল। কী সাহস! রাজাপ্পা সমুচিত জবাব দিল, 'তুই কি তোর বাচ্চা ভাইকে আমার কাছে তিরিশ টাকায় বিক্রি করবি?' ছেলেরা জবাবটার তারিফ করল।

কিন্তু এখন কেউ আর ওর অ্যালবামটার দিকে তাকায়ই না। আরো কি সব বলত। নাগরাজনের অ্যালবামের কাছেপিঠে আসার যোগ্যতাও নাকি ওর অ্যালবামের নেই।

রাজাপ্পা নাগরাজনের অ্যালবামটা তাকিয়ে দেখতেও রাজি নয়। অন্য ছেলেরা যখন ঘিরে ধরে নাগরাজনের অ্যালবামটা দেখত, রাজাপ্পা ওর মুখ ফিরিয়ে নিত, অবশ্য চোরা দৃষ্টিতে অ্যালবামটা দেখত সত্যি, অপরূপ সুন্দর ওটা। হয়ত রাজাপ্পার যে সব টিকিট ছিল সে সব ওটায় ছিল না, হয়ত অত বেশি টিকিটও ছিল না, কিন্তু ওটা ছিল একেবারে অদ্বিতীয়। কোনো স্থানীয় দোকানে অমন অ্যালবাম পাওয়া যায় না।

নাগরাজনের কাকা অ্যালবামের প্রথম পাতায় মোটা মোটা অক্ষরে ভাইপোর নাম লিখে দিয়েছিলেন : এস নাগরাজন। এর নীচে লেখা ছিল :

'এই অ্যালবামটা চুরি করতে চেষ্টা করছ যে নির্লজ্জ হতভাগা, তাকে বলছি ...'

'ওপরে আমার নামটা দেখেছ? এটা আমার অ্যালবাম। এটা আমার এবং যতদিন ঘাসের রং সবুজ আর পদ্মফুল লাল, সূর্য পূর্বে উঠবে আর পশ্চিমে অস্ত যাবে একমাত্র আমারই থাকবে।'

ছেলেরা এই লাইন কটা তাদের অ্যালবামে টুকে নিল। মেয়েরাও তাদের বই আর খাতায়।

রাজাপ্পা রেগে গিয়ে বলল, 'তোরা এমন নকল-নবীশ হয়েছিস কেন রে?'

ছেলেরা ওর দিকে কটকট করে তাকাল, কৃষ্ণান সমুচিত জবাব দিল, 'কেটে পড় হিংসুটে পোকা!'

'হিংসুটে! আমি! আমি কেন হিংসুটে হব? আমার অ্যালবামটা অনেক বড়ো নয়? নয়?'

'তোর ওর মতো টিকিট নেই! ইন্দোনেশীয় সুন্দরীটাকে দ্যাখ ... তুলে ধর, আলোতে দ্যাখ।'

'আমার যা টিকিট আছে ওর নেই।'

''ফুঃ! একটা দেখা যেটা ওর নেই।''

'দশ টাকা বাজি ধর। তোরা আমাকে একটা দেখা যা আমার নেই।'

কৃষ্ণান ঠাট্টা করে বলল, 'তোর অ্যালবামটা ডাস্টবিনে রাখার যোগ্য।' সঙ্গের ছেলেরা চেঁচাতে লাগল, 'বাজে অ্যালবাম। বাজে অ্যালবাম!'

রাজাপ্পা বুঝতে পারল এদের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই।

কতদিন ধরে ও এত টিকিট সংগ্রহ করেছে! একটা একটা করে। আর হঠাৎ একদিন পিয়ন নাগরাজনের সিঙ্গাপুরের অ্যালবামটা নিয়ে এল আর অমনি নাগরাজন মহামান্য লোক হয়ে গেল! ছেলেরা দুটোর মধ্যে তফাতও বোঝে না। যতই বোঝানো যাক, কিছুই ফল হবে না।

রাজাপ্পা ভেতরে খাক হয়ে যাচ্ছিল। ক্রমশ ওর স্কুল যেতেও বিতৃষ্ণা জাগতে লাগল। ছেলেগুলোর সঙ্গে মিশবে কী করে? সাধারণত শনি আর রবিবার ও ছোটাছুটি করে টিকিট সংগ্রহ করত, কিন্তু এ-সপ্তাহে ও বাড়ি থেকে প্রায় নড়লই না। সাধারণত অ্যালবামের পাতা উল্টোয়নি এমন একটা দিনও যেত না। এমন কি রাত্রিবেলা ও লুকিয়ে বিছানা থেকে বেরিয়ে এসে অ্যালবাম দেখত। কিন্তু গত দুদিন ওটাকে স্পর্শও করেনি। ওটাকে দেখলেই ওর রাগ হয়। নাগরাজনের অ্যালবামের তুলনায় নিজেরটাকে এখন এক আঁটি ছেঁড়া ন্যাকড়া বলে মনে হয়।

সন্ধ্যাবেলা রাজাপ্পা নাগরাজনের বাড়ি গেল। ও মনস্থির করে ফেলেছিল। এই অসম্মান ও আর সহ্য করবে না। নাগরাজন হঠাৎ ঘটনাচক্রে একটা টিকিটের অ্যালবাম পেয়েছে, এই তো! টিকিট সংগ্রহে রহস্যের বিষয়ে ও কী জানে? অথবা কী করে অভিজ্ঞতা টিকিটের মূল্য নির্ধারণ করে তা কী করে জানবে? ও হয়তো মনে করে, আকারে যতো বড়ো হবে, ততো দামি হবে অ্যালবাম। অথবা হয়তো মনে করে, শক্তিশালী দেশের টিকিট দুর্বল দেশের টিকিটের থেকে বেশি দামি। যাই বলো, নাগরাজন অপেশাদার বই তো নয়। রাজাপ্পা সহজেই কম দামি টিকিট দিয়ে দামিগুলো হাতিয়ে নিতে পারবে। ও আগেও অনেককে এমন ঠকিয়েছে। টিকিট সংগ্রহের দুনিয়াতে এমনি চালাকি-প্রতারণা খুব চলে, নাগরাজন তো শিক্ষার্থী মাত্র।

রাজাপ্পা সোজা দোতলায় নাগরাজনের ঘরে গেল। কেউ বাধা দেয়নি কারণ, ও প্রায়ই এবাড়িতে আসত। রাজাপ্পা নাগরাজনের ডেস্কে বসে পড়ল। খানিক বাদে নাগরাজনের ছোটো বোন, কামাক্ষী, এল।

'দাদা শহরে গেছে, তুমি কি ওর নতুন অ্যালবাম দেখেছ?'

রাজাপ্পা বিড়বিড় করে কী বলল বোঝা গেল না।

'এটা সত্যি খুব সুন্দর, তাই না? মনে হয়, স্কুলে আর কারো এত সুন্দর অ্যালবাম নেই।'

'কে বলেছে?'

'আমার ভাই।'

'এটা শুধু বড়ো অ্যালবাম, এই পর্যন্ত। শুধু বেঢপ বড়ো হলেই হলো?'

কামাক্ষী কিছু না বলে চলে গেল।

রাজাপ্পা টেবিলের ছড়ানো বইগুলো দেখল। ওর হাত আলতোভাবে টেবিলের ড্রয়ারের তলাটা ছুঁয়ে গেল। অসচেতন ভাবে ও ড্রয়ারটা টানল। তালা লাগানো ছিল। খুললে কেমন হয়? চাবিটা তো বইগুলোর মধ্যেই। রাজাপ্পা সিঁড়ির কাছে গিয়ে চারদিকে দেখে এল। কাউকে দেখা গেল না। ড্রয়ারটা খুলল। নাগরাজনের টিকিটের অ্যালবাম ওপরেই আছে। রাজাপ্পা প্রথম পাতাটা উল্টিয়ে লেখাগুলো পড়ল। ওর বুক টিপটিপ করতে লাগল। ড্রয়ারে তালা লাগিয়ে দিল। অ্যালবামটা হাফ প্যান্টের ভেতরে চালিয়ে দিয়ে সার্টটা নামিয়ে দিল। তারপর তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নেমে এক ছুটে বাড়ি।

বাড়িতে পৌঁছে ও অ্যালবামটা বইয়ের র‍্যাকের পেছনে লুকিয়ে রাখল। শরীর দিয়ে তখন হল্কা বেরুচ্ছে, গলা শুকিয়ে কাঠ, মাথায় রক্তের চাপ বোধ হচ্ছে।

রাত আটটার সময় আপ্পু, যে ওর বাড়ির উল্টো দিকে থাকে, এসে রাজাপ্পাকে বলল যে, নাগরাজনের অ্যালবামটা চুরি গেছে। ও আর নাগরাজন শহরে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে অ্যালবামটা চুরি গেছে।

রাজাপ্পা একটা কথাও বলল না, ও মনে মনে প্রার্থনা করল, আপ্পু যেন চলে যায়। আপ্পু চলে গেলে, ও দৌড়ে নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল আটকে দিল। তারপর শেলফের পেছন থেকে অ্যালবামটা বের করে আনল। হাত যেন জমে গেল। কী হবে যদি কেউ জানালা দিয়ে দেখে থাকে? ও ফের অ্যালবামটা শেলফের পেছনে রেখে দিল।

রাজাপ্পা রাত্রিরে খাবার প্রায় ছুঁলই না। ওর বাবা মা চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, শরীর ভালো আছে কিনা। হয়ত ঘুমিয়ে পড়লে শান্তি আসবে। রাজাপ্পা বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঘুম কিন্তু এল না। কী হবে যদি ও ঘুমিয়ে থাকার সময় কেউ অ্যালবামটা দেখে ফেলে? ও উঠে অ্যালবামটা বের করে বালিশের তলায় রেখে দিল।

রাজাপ্পা ঘুম থেকে ওঠার আগেই আপ্পু সকালে এসে হাজির। আপ্পু কিছুক্ষণ আগেই নাগরাজনের বাড়ি গিয়েছিল।

'আমি শুনলাম, তুই কাল ওর বাড়ি গিয়েছিলি?'

রাজাপ্পার মনে হল ওর বুকের ধুকপুকুনি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ-ও হয়, না-ও হয় এভাবে মাথা নাড়ল।

'কামাক্ষী বলল, আমি আর নাগরাজন যখন শহরে গিয়েছিলাম, তখন তুই-ই একমাত্র ওদের বাড়িতে গিয়েছিলি?'

রাজাপ্পা আপ্পুর কথার সুরে সন্দেহ আঁচ করতে পারল।

'নাগরাজন সারা রাত ধরে কেঁদেছে। ওর বাবা পুলিশকে খবর দিতে পারে।'

রাজাপ্পা কোনো কথা বলল না।

নাগরাজনের বাবা পুলিশ সুপারের অফিসে কাজ করতেন। ওর ইঙ্গিত মাত্রে পুলিশবাহিনী অ্যালবাম খুঁজতে বেরিয়ে পড়বে।

রাজাপ্পার ভাগ্য ভালো, যে আপ্পুর ভাই তাকে ডাকতে এল। ও চলে যাবার অনেকক্ষণ পর অব্দি রাজাপ্পা নিজের বিছানায় নিথর হয়ে বসে থাকল। বাবা সকালের খাবার খেয়ে সাইকেল করে অফিসে চলে গেলেন।

সামনের দরজায় টোকা দেবার আওয়াজ। তবে কি পুলিশ?

রাজাপ্পা বালিশের তলা থেকে অ্যালবামটা আঁকড়ে ধরে, এক ছুটে ওপরে গিয়ে বইয়ের তাকের পেছনে ওটা রেখে দেয়। কী হবে যদি পুলিশ খোঁজাখুজি করে? তাক থেকে ওটা বের করে শার্টের নীচে ঢুকিয়ে নীচে নেমে এল।

কেউ দরজায় টোকা দিয়েই যাচ্ছে। রান্নাঘর থেকে মা চেঁচিয়ে বললেন, 'দরজাটা খুলছিল না কেন?' খানিকক্ষণ পরে উনি নিজেই দরজা খুলে দেবেন ঠিক করলেন।

রাজাপ্পা ছুটে বাড়ির পেছনে চানের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। চানের জল গরম করার জন্য একটা বড়ো উনুন ছিল। রাজাপ্পা উনুনের মধ্যে অ্যালবামটা ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অমূল্য সব টিকিট পুড়ে গেল — এমন সব টিকিট যা আর কোথাও পাওয়া যাবে না। রাজাপ্পার চোখ জলে ভরে গেল।

মা চেঁচাচ্ছিলেন, 'তাড়াতাড়ি আয়, নাগরাজন তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'

রাজাপ্পা হাফ প্যান্টটা খুলে ভেজা তোয়ালে জড়িয়ে, চানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওপরে গেল। নাগরাজন একটা চেয়ারে বসেছিল।

ভাঙা গলায় নাগরাজন বলল, 'আমার টিকিটের অ্যালবাম হারিয়ে গেছে।' ওর মুখে দুঃখের ছাপ, আর দু চোখ ফুলে লাল।

রাজাপ্পা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় রেখেছিলি?'

'আমি নিশ্চিত, আমি ওটাকে টেবিলের ড্রয়ারে রেখেছিলাম। ড্রয়ারটাতে চাবিও লাগিয়েছিলাম। আমি খানিকক্ষণের জন্য বেরিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি ওটা হাওয়া হয়ে গেছে।'

ওর গাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে। নিজেকে এত দোষী মনে হচ্ছিল যে রাজাপ্পা বন্ধুর দিকে তাকাতে পারছিল না, নাগরাজনকে বলল, ''কাঁদিস না।''

কিন্তু যতই নাগরাজনকে সে শান্ত করতে চেষ্টা করছিল, ততই সে কাঁদতে লাগল।

রাজাপ্পা ছুটে নীচে গেল, তারপর মুহূর্তে নিজের অ্যালবামটা হাতে করে নিয়ে এল।

'নাগরাজন, এই আমার অ্যালবাম। এটা তোর। আমার দিকে এভাবে তাকাস না। আমি সত্যি তোকে এটা দিচ্ছি। অ্যালবামটা তোর।'

'তুই ঠাট্টা করছিস ...'

'না। আমি এটা তোকে দিচ্ছি। সত্যি, আজ থেকে এটা তোর। এটা ধর।'

নাগরাজন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। রাজাপ্পা তার অ্যালবাম দিয়ে দিচ্ছে! রাজাপ্পা ওকে নেবার জন্য অনুরোধ করে যাচ্ছে!

নাগরাজন জিজ্ঞেস করল, 'তোর কী হবে?'

'আমি আর এটা চাই না।'

'একটা টিকিটও না?'

'না, একটাও না।'

'কিন্তু তুই তোর টিকিট ছাড়া কী করে বাঁচবি?'

রাজাপ্পার চোখ জলে ছলছল করে উঠল।

'কাঁদিস না। তোকে অ্যালবাম দিতে হবে না। রেখে দে। কত কষ্ট করে এটা বানিয়েছিস।'

'না। তুই রাখ। এটা তোর জন্য। বাড়ি নিয়ে যা। দয়া করে নে, নিয়ে চলে যা।' কাঁদতে কাঁদতে রাজাপ্পা বলল।

নাগরাজন হতবুদ্ধি হয়ে গেল। অ্যালবামটা নিয়ে নীচে নেমে এল। রাজাপ্পা জামার খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ওর সঙ্গে সঙ্গে এল।

ওরা দরজায় এসে দাঁড়াল। নাগরাজন বলল, 'ধন্যবাদ। চলি রে।'

নাগরাজন রাস্তায় নেমে এসেছে, এমন সময় রাজাপ্পা ওকে ডাকল। নাগরাজন ফিরে এল।

'তুই যদি দয়া করে অ্যালবামটা শুধু আজ রাত্রিরের জন্য দিস, কাল সকালেই তোকে ফিরিয়ে দেবো।'

নাগরাজন রাজি হয়ে ফিরে গেল।

রাজাপ্পা সিঁড়ি বেয়ে ওর ঘরে ঢুকে খিল দিয়ে দিল। অ্যালবামটা শক্ত করে জাপটে ধরে, হু হু করে কাঁদতে লাগল।

হাতে কলমে

সুন্দর রামস্বামী (১৯৩১—২০০৫) : তামিল সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ লেখক। *কালাচুবাড়ু* পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন। *ওরু পুলিয়া মারাথিন কথাই* (একটি তেঁতুলগাছের গল্প) এবং *কুঝানথৈকন, পেনকল, আনকল* (শিশু, নারী, পুরুষ) উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। তিনি *পদুবিয়া* ছদ্মনামে লিখতেন। ২০০৪ সালে *কথাচূড়ামণি* পুরস্কারে তিনি ভূষিত হন। গল্পটি বাংলায় তরজমা করেছেন অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত।

১.১ সুন্দর রামস্বামী কোন ভাষার লেখক?

১.২ তিনি কোন ছদ্মনামে লিখতেন?

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১. ‘টিকিটের অ্যালবাম’ গল্পের লেখক কে?

২.২. মূল গল্পটি কোন ভাষায় রচিত?

২.৩. গল্পটিতে মোট কটি চরিত্রের দেখা পাওয়া যায়?

২.৪. মেয়েদের পক্ষ থেকে কে নাগরাজনের থেকে অ্যালবামটি চেয়ে নিয়ে যেত?

২.৫. রাজাপ্পা কীভাবে তার অমূল্য ডাকটিকিটগুলি সংগ্রহ করত?

২.৬. নাগরাজনের অ্যালবামটি তাকে কে উপহার দিয়েছিলেন?

২.৭ সেই অ্যালবামের প্রথম পাতায় কী লেখা ছিল?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

৩.১ নাগরাজনের অ্যালবামের প্রতি সকলে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল কেন?

৩.২ ‘কেটে পড় হিংসুটে পোকা!’ — বক্তা কে? কাকে সে এমন কথা বলেছে? তুমি কি এই কথার মধ্যে কোনো যুক্তি খুঁজে পাও?

৩.৩ ‘এদের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই।’ — উপলব্ধিটি কার? কী বিষয়ে তর্কের প্রসঙ্গ এসেছে? তর্ক করে লাভ নেই কেন?

৪. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৪.১ ‘হঠাৎ যেন ওর জনপ্রিয়তা কমে গেছে’ — কার এমন মনে হয়েছে? এই ‘জনপ্রিয়তা’ হঠাৎ কমে যাওয়ার কারণ কী?

৪.২ ‘কেউ রাজাপ্পার অ্যালবামের কথা উল্লেখও করত না, বা, তাকে পাত্তাও দিত না।’ — সকলের এমন আচরণের কারণ গল্প অনুসরণে আলোচনা করো।

৪.৩ স্কুলের ছেলেমেয়েদের নাগরাজন কীভাবে তার নিজের অ্যালবামটি দেখতে দিত?

৪.৪ ডাকটিকিট সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে রাজাপ্পার তীব্র আকর্ষণের যে পরিচয় গল্পে রয়েছে তা আলোচনা করো।

৪.৫ ‘চোরাদৃষ্টিতে অ্যালবামটা দেখত’ — সেই চোরাদৃষ্টিতে দেখা অ্যালবামটির কোন বিশেষত্বের কথা গল্পে রয়েছে?

৪.৬ নাগরাজনের প্রতি রাজাপ্পা কীভাবে ক্রমশ ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিল?

৪.৭ ‘সন্ধ্যাবেলা রাজাপ্পা নাগরাজনের বাড়ি গেল।’ — কোন উদ্দেশ্য নিয়ে রাজাপ্পা নাগরাজনের বাড়িতে গিয়েছিল? এর মধ্যে দিয়ে তার চরিত্রের কোন দিকটি ধরা পড়ে?

৪.৮ ‘রাজাপ্পার চোখ জলে ভরে গেল।’ — কোন পরিস্থিতিতে রাজাপ্পার চোখ জলে ভরে উঠল?

৪.৯ ‘নাগরাজন হতবুদ্ধি হয়ে গেল।’ — তার হতবুদ্ধি হয়ে পড়ার কারণ কী?

৪.১০ ‘কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হয়েই ‘টিকিটের অ্যালবাম’ গল্পে রাজাপ্পার আত্মশুদ্ধি ঘটেছে।’ — গল্পের ঘটনা বিশ্লেষণ করে উদ্ধৃতিটির যথার্থতা প্রতিপন্ন করো।

৫. নীচে তোমাদের জন্য কয়েকটি ভারতীয় ডাকটিকিটের ছবি দেওয়া রইল। তোমরা এমনই অনেক ভারতের কিংবা অন্যান্য দেশের ডাকটিকিট সংগ্রহ করে একটি অ্যালবাম তৈরি করো।

লোকটা জানলই না

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বাঁ দিকের বুক-পকেটটা সামলাতে সামলাতে
হায়-হায়
লোকটার ইহকাল পরকাল গেল।
অথচ
আর একটু নীচে
হাত দিলেই সে পেত
আলাদিনের আশ্চর্য-প্রদীপ
তার হৃদয়

লোকটা জানলই না।

তার কড়িগাছে কড়ি হলো
লক্ষ্মী এলেন
রণ-পায়ে।
দেয়াল দিল পাহারা
ছোটোলোক হাওয়া
যেন ঢুকতে না পারে।
তারপর
একদিন গোগ্রাসে গিলতে গিলতে
দু আঙুলের ফাঁক দিয়ে
কখন
খসে পড়ল তার জীবন —

লোকটা জানলই না।।

হাতে কলমে

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯—২০০৩) : বাংলা কবিতায় এক উল্লেখযোগ্য নাম কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *পদাতিক* প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে *অগ্নিকোণ, চিরকুট, ফুল ফুটুক, যত দূরেই যাই, কাল মধুমাস, ছেলে গেছে বনে, জল সইতে,* প্রভৃতি। তাঁর গদ্য রচনার দৃষ্টান্ত *কাঁচা-পাকা, ঢোল গোবিন্দের আত্মদর্শন* প্রভৃতি গ্রন্থে ছড়িয়ে রয়েছে।

১.১ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

১.২ তাঁর লেখা দুটি গদ্যগ্রন্থের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

২.১ ‘বাঁদিকে বুক পকেটটা সামলাতে সামলাতে ...’ — এখানে ‘বাঁদিকের বুক পকেট’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

২.২ ‘ইহকাল পরকাল’ — এই শব্দদ্বয় এখানে কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

২.৩ কবিতায় লোকটির দু-আঙুলের ফাঁক দিয়ে কী খসে পড়ল?

২.৪ ‘আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ’ আসলে কী? তাকে এরকম বলার কারণ বুঝিয়ে দাও?

শব্দার্থ : কড়ি — শামুক জাতীয় প্রাণীর খোল বিশেষ। এক সময়ে আমাদের দেশে বিনিময় মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হতো। রণপা — বাঁশ ও কাঠের তৈরি কৃত্রিম লম্বা পা।

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর কয়েকটি বাক্যে লেখো :**

৩.১ ‘লোকটা জানলই না’ পঙ্‌ক্তিটি দুবার কবিতায় আছে। একই পঙ্‌ক্তিটি একাধিকবার ব্যবহারের কারণ কী?

৩.২ কবি ‘হায়-হায়’ কোন প্রসঙ্গে বলেছেন? কেন বলেছেন?

৩.৩ কবিতাটির নামকরণ যদি হতো ‘হৃদয়’ বা ‘আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ’ তাহলে তা কতটা সার্থক হতো?

৩.৪ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখার যে ধরন তোমার চোখে পড়েছে তা নিয়ে বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো।

৪. ‘অথচ’ শব্দটিকে ব্যাকরণের ভাষায় কী বলি? কবিতায় এই ‘অথচ’- শব্দটির প্রয়োগ কবি কেন করেছেন ?

৫. ‘আলাদিনের আশ্চর্য -প্রদীপ’ পঙ্‌ক্তিটিতে মোট ক’টি দল? রুদ্ধদল এবং মুক্তদলের সংখ্যাই বা কত?

৬. কবিতার মধ্যে অসমাপিকা ক্রিয়ার সংখ্যা ক’টি ও কী কী?

বই পড়ার কায়দা কানুন ৪

লাইব্রেরি এল কেমন করে ?

ক্লাসে না এলেও প্রিয় বন্ধু ক্লাসের পড়ানোর বিষয় তোমার জন্য লিখে রাখলে তুমি তা সহজেই পেয়ে যাও, ফলে পড়া তৈরি করা সহজ হয়। তেমনি আমাদের আগের যুগের মানুষরাও যা জেনেছে, যা শিখেছে বা জীবনে চলতে গিয়ে যে সব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে, লিখতে শেখা মাত্রই সেই জ্ঞান লিখে রেখে গেছে পরের যুগের মানুষের জন্যে, যাতে পরের যুগের মানুষেরা বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করে নিজেদের জীবনকে সহজ করে চালাতে পারে। যুগ যুগ ধরে মানুষের মধ্যে তার সময়ের কথা পরের পরের যুগের মানুষকে জানানোর একটা চেষ্টা থাকে।

আজকের দিনে কাজটা খুব সহজ মনে হলেও অনেক আগে তা কিন্তু অত সহজ ছিল না। কারণ অনেককাল মানুষ লিখতে জানত না, সে সময়ের কথা তারা মনে রাখতো আর মুখে মুখে সে কথা জানিয়ে যেত পরের কালের মানুষদের। লিখতে শেখার পর আজ থেকে প্রায় ৫৬০০ বছর আগে সুমেরিয়রা কাদা মাটির চাকতি করে তার ওপরে ছুঁচলো নলখাগড়ার কলম দিয়ে লিখে সেগুলো পুড়িয়ে পরপর সাজিয়ে রাখতো। এর পরে পাথরের বা পশুর চামড়ার ওপরেও লেখার চেষ্টা হয়েছে। মাটি বা পাথরের ফলক খুব ভারী বলে ব্যবহারের অসুবিধা হতো।

প্রায় ৫৫০০ বছর আগে মিশরের মানুষেরা নীল নদের ধারে প্যাপিরাস নামে আট-দশ ফুট লম্বা গাছের ছাল একটার পরে একটা জুড়ে রোদে শুকিয়ে লেখার উপযোগী করে তার ওপরে লেখা শুরু করল। এগুলো গুটিয়ে রাখা হতো। প্যাপিরাস শব্দটা থেকেই পরবর্তীকালে ইংরাজিতে ‘পেপার’ অর্থাৎ কাগজ শব্দটা এসেছে। প্যাপিরাসের মতো আমাদের দেশে ভুজগাছের ছাল এবং তালগাছের পাতাও লেখার কাজে ব্যবহৃত হতো। তালপাতা বা ভুজগাছের ছাল একটা নির্দিষ্ট মাপে কেটে লেখার উপযোগী করে হাতে লেখার পর কাঠের পাটাতনের মধ্যে পরপর থাক দিয়ে সাজিয়ে কাপড় দিয়ে মুড়ে রাখা হতো। এভাবেই তৈরি হতো তালপাতার পুথি বা ভূর্জপত্রের পুথি। ছাপানো বইয়ের আগে এভাবেই এক সময়ের মানুষেরা তাদের জানা বিদ্যা, নানা অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি খুব কষ্ট করে প্রথমে মাটির ফলকে, তারপরে পাথরে, ক্রমে প্যাপিরাস, ভেলামেন, পার্চমেন্ট, তালপাতা বা ভূর্জপত্র ইত্যাদিতে লিখে গিয়েছিল বলেই না তাদের কথা আমরা পরের সময়ের মানুষেরা জানতে পেরেছি। তবে সমাজের অল্প কিছু জ্ঞানীগুণী মানুষদের কাছে থাকতো এই সব পুথি এবং তাঁরাই সেগুলো জানতেন, সমাজের সবাই তা জানতে পারতো না।

কাগজ তৈরি ও মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের ফলে মানুষ যখন বই ছাপানোর কৌশল শিখল তখন থেকেই এক যুগের মানুষের স্মৃতি, জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার ফসল বইয়ের মাধ্যমে অনেক মানুষের কাছে সহজে পৌঁছে যেতে

পারল। প্রথমে রাজারাজড়া বা ধনী লোকেদের অধিকারে এই সব বইয়ের সংগ্রহ থাকলেও ক্রমে মানুষ যাতে সহজে জানতে, শিখতে বা আনন্দ পেতে পারে সে জন্য সমাজের দরকারেই লাইব্রেরি গড়ে উঠল। প্রায় ৫০০ বছরের বেশি সময় ধরে বই-ই মানুষের জানার, শেখার বা পড়ে আনন্দ পাওয়ার প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠল। লাইব্রেরিতে ধরে রাখা তথ্য জানতে পারার ফলেই পরের যুগের মানুষ সহজেই আগের যুগের মানুষের নানা কাজের ভুল বা সমস্যাগুলোর সমাধান করে ক্রমশ উন্নতি করতে পেরেছে। তাই একথা বললে ভুল হবে না আজকের সভ্যতার উন্নতিতে লাইব্রেরির খুব বড় ভূমিকা আছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে 'লাইব্রেরি' শব্দটার অর্থও বদলে গেছে। আজকের দিনে লাইব্রেরি বলতে শুধু বইয়ের সংগ্রহ বোঝায় না। লাইব্রেরিতে এখন বই ছাড়াও সিডি, ডিভিডি ইত্যাদি থাকে। এগুলোকে বলে ডিজিটাল মাধ্যম। 'লাইব্রেরি' শব্দের উৎপত্তি লাতিন ভাষায় 'liber' ('লাইবার' বা 'লিবার') শব্দ থেকে। এই শব্দের মানে গাছের ছালের ভেতরের দিক, যে দিকে লেখা হতো। লেখা ছালগুলোকে পাতা ধরে পরপর গুছিয়ে রাখা হতো বলে তাদের সংগ্রহকে বলা হতো 'লাইব্রেরি'। এখন অবশ্য কোনো লাইব্রেরিতেই তেমন সংগ্রহ পাওয়া যাবে না। কম্পিউটার আর ইন্টারনেট আবিষ্কারের ফলে লাইব্রেরির ধারণা আরো বদলে গেছে। এখন যে কোনো তথ্য অনেক সময়েই আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বইয়ের চেয়ে অনেক সহজে, অনেক তাড়াতাড়ি পেতে পারি, অথচ আমরা জানতে পারিনা যে সেই তথ্যটা ঠিক কোন জায়গায় বা কোন লাইব্রেরেতে রাখা আছে। বিভিন্ন লাইব্রেরিতে থাকা তথ্য বা বিভিন্ন মানুষের দেওয়া তথ্য একাধিক কম্পিউটারের সংযোগের মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে আসে। বাড়িতে বসেই লাইব্রেরি ব্যবহারের সুবিধা পাওয়া যায়। তাই আজকের দিনে এ ধরনের লাইব্রেরিকে বলে 'দেওয়ালবিহীন লাইব্রেরি' (Library without walls) ।

'লাইব্রেরি' নামের প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন : মানুষের মধ্যে 'সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে' ... 'লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্রপথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। ... যে দিকে ইচ্ছা ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না'।

বিভিন্ন যুগে লাইব্রেরির সংগ্রহের প্রকৃতি বা চরিত্র বদলায় কিন্তু লাইব্রেরির উদ্দেশ্য একই থাকে। প্রাচীন যুগের প্যাপিরাস বা তালপাতার পুঁথি বা পরের কালের বই বা আজকের দিনে ডিজিটাল মাধ্যম যাই আসুক না কেন মানুষের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা যুগে যুগে প্রবাহিত হয় পরবর্তী প্রজন্মের কাছে লাইব্রেরির হাত ধরে। তাই লাইব্রেরিকে বলা হয় 'মানব সমাজের সামগ্রিক স্মৃতির সংগঠিত বহিঃপ্রকাশ'।

---

১) নিজের বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে বা অন্য কোনো লাইব্রেরিতে গিয়ে ক্যাটালগ বা সূচি দেখে বই খোঁজার কৌশল শিখে নাও।

২) পঞ্চম শ্রেণি থেকে যে বই পড়ার ডায়েরি লিখেছে তার থেকে বিষয় ধরে ও লেখক ধরে বইয়ের বর্ণানুক্রমিক তালিকা তৈরি করো।

৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধটি পড়ে নিতে পারো।

বই পড়ার ডায়েরি

বইয়ের নাম	বই পড়ার তারিখ	বিষয় বা ধরন	কীভাবে পেলে	তোমার মতামত

বই পড়ার ডায়েরি

বইয়ের নাম	বই পড়ার তারিখ	বিষয় বা ধরন	কীভাবে পেলে	তোমার মতামত

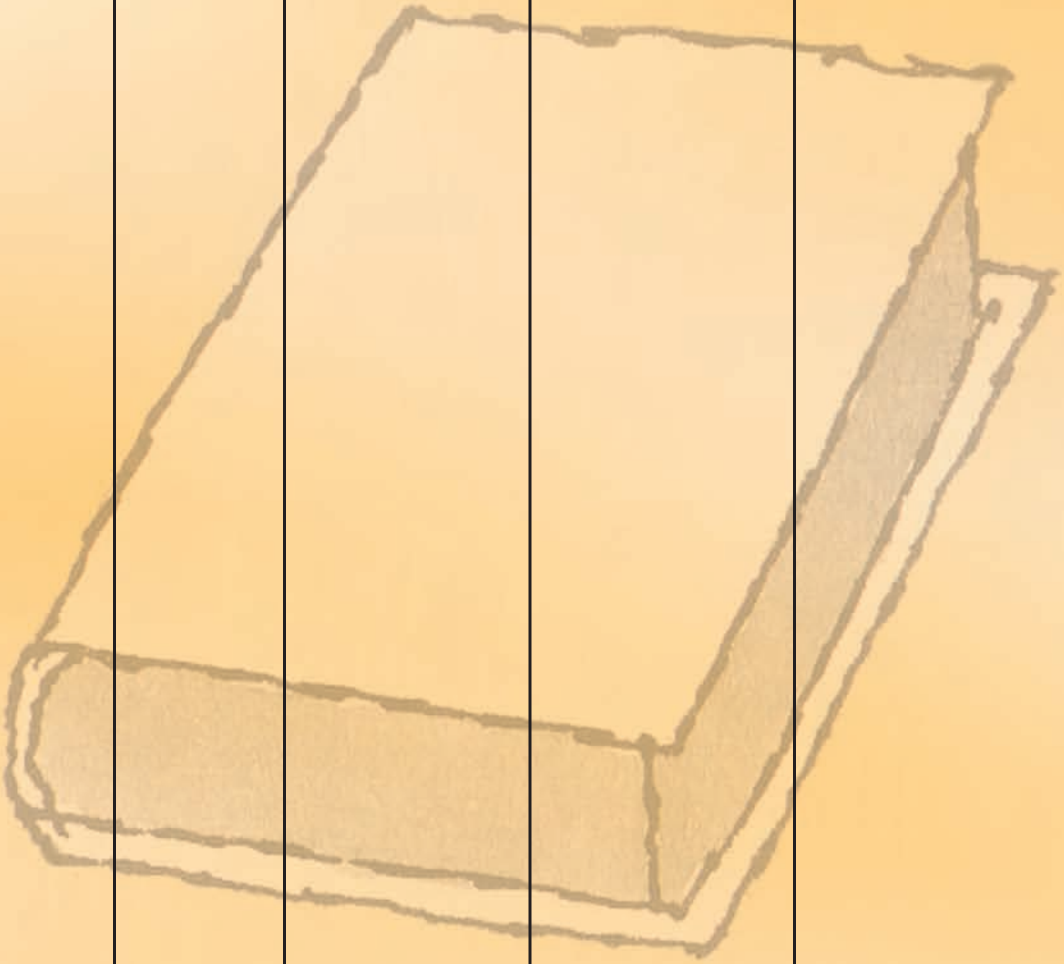

শিখন পরামর্শ

- জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা -২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন -২০০৯ নথি দুটিকে ভিত্তি করে নতুন পাঠ্যপুস্তকটি (অষ্টম শ্রেণির বাংলা) রূপায়িত হলো। বইটির পরিকল্পনায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে শ্রেণিশিখনের পূর্বে শিক্ষক/শিক্ষিকা সযত্নে পুরো বইটি পড়ে নেবেন।
- পাঠ্য এই বইটির ভাবমূল (Theme) 'বন্ধুত্ব ও সমানুভূতি'। ছাত্রছাত্রীরা এই বইয়ের বিভিন্ন পাঠে পড়বে বন্ধুত্ব ও সমানুভূতির বিভিন্ন দিক। একই সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই বইয়েও আছে স্বদেশ ও স্বাধীনতা বিষয়ক গান, গল্প, এবং কবিতা।
- এই বইটির 'হাতে কলমে' অংশটিতে CCE পুস্তিকার বিভিন্ন দিকনির্দেশগুলি অনুসৃত হয়েছে। প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের বিভিন্ন সূচক যেমন এই সমস্ত 'হাতে কলমে' অংশে ব্যবহার করা যাবে তেমনই পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যেরও প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ মুক্ত চিন্তা চর্চার পরিসর (Open Ended Learning Task), বিভিন্ন অর্জিত সামর্থ্যগুলি সম্পূর্ণ শিক্ষাবর্ষ জুড়ে চর্চার সুযোগ গড়ে উঠবে। শিক্ষিকা/শিক্ষকদের মূল্যায়ন বিষয়ে যাবতীয় অস্পষ্টতা দূর করতেই এই প্রয়াস।
- শিশুশিক্ষার্থীর সুবিধার কথা ভেবে বাংলাভাষায় অতিপ্রচলিত যে-শব্দগুলির দুটি অর্থ আছে, তাদের বানানে আমরা সামান্য পার্থক্য এনেছি। এইজন্য হতো, হলো, মতো, ভালো, করো, প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর কবি, লেখক লেখিকাদের নামের বানানের ক্ষেত্রে মূল রূপটি অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

* 'ছোটোদের পথের পাঁচালী' বইটি গোটা বছর ধরে পড়াতে হবে। বইটির শেষ অংশে 'হাতে-কলমে' অংশে কিছু নমুনা প্রশ্ন থাকল। এর সাহায্য নিয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকা নতুন-নতুন প্রশ্ন ও অন্যান্য কৃত্যালি উদ্ভাবন করবেন এবং এইভাবে সক্রিয়তাভিত্তিক শিখন ও নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের ধারাটি বজায় রাখবেন।

শিক্ষাবর্ষে পাঠপরিকল্পনার পাঠক্রম ও সম্ভাব্য সময়সূচি :

মাসের নাম		পাঠের নাম
জানুয়ারি	প্রথম পর্যায়	বোঝাপড়া, অদ্ভুত আতিথেয়তা, প্রাণ ভরিয়ে (গান), চন্দ্রগুপ্ত
ফেব্রুয়ারি	প্রথম পর্যায়	বনভোজনের ব্যাপার (নিখিল-বঙ্গ-কবিতা-সংঘ), সবুজ জামা, চিঠি (আলাপ)
মার্চ	প্রথম পর্যায়	পরবাসী, পথচল্‌তি, একটি চড়ুই পাখি
এপ্রিল	দ্বিতীয় পর্যায়	দাঁড়াও, পল্লীসমাজ, ছন্নছাড়া, গাঁয়ের বধূ (গান)
মে	দ্বিতীয় পর্যায়	গাছের কথা, হাওয়ার গান
জুন ও জুলাই	দ্বিতীয় পর্যায়	কী করে বুঝব, রূপসী বাংলা, আষাঢ়ের কোন (গান), ঘরোয়া (স্বাদেশিকতা), সোজন বাদিয়ার ঘাট
আগস্ট	তৃতীয় পর্যায়	জেলখানার চিঠি, স্বাধীনতা, আদাব, ভয় কি মরণে (গান)
সেপ্টেম্বর	তৃতীয় পর্যায়	হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভালোবাসা কি বৃথা যায়?), ঘুরে দাঁড়াও, সুভা
অক্টোবর ও নভেম্বর	তৃতীয় পর্যায়	পরাজয়, মাসিপিসি, টিকিটের অ্যালবাম, লোকটা জানলই না